

বঙ্গ

কমলবাতা

সংখ্যা-সেপ্টেম্বর। সাল-২০২৬



পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় স্মরণে

প্রধানমন্ত্রী
শ্রী নরেন্দ্র মোদীর
সেবা-সমর্পণের

২৫ বছর
পূর্তি উপলক্ষে

**সেবা সংকল্প
অভিযান**

জনসেবা থেকে রাষ্ট্রসেবা



সেবাই
সংকল্প
সেবাই
ভারত



শিক্ষা
সবার জন্য



স্বাস্থ্য
সবার অধিকার



কৃষকের
সমৃদ্ধি



নারীর ক্ষমতায়ন



যুবশক্তির
উন্নয়ন



পরিকাঠামোতে
অগ্রগতি



সবুজ
ভবিষ্যৎ



২৫ বছর সেবার অভিজ্ঞতা —
আগামী ভারতের জন্য নতুন সংকল্প



নয়াদিল্লির ভারত মন্ডপমে 'ব্রিকস ২০২৬ শীর্ষ সম্মেলন'এ বিশ্বের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। উদ্বোধনী অধিবেশনে বিদেশি প্রতিনিধিদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁদের ভারতে স্বাগত জানাতে পেরে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত। ভারত ব্রিকসের সভাপতিত্বের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও জোরদার করার পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন ও স্থায়িত্বের লক্ষ্যে কাজ করতে চায় বলেও বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী।



সেবা সংকল্প অভিযানঃ জনসেবা থেকে রাষ্ট্রসেবা জয়ন্ত গুহ	৬
আজকের প্রজন্ম ‘জেন-জি’ নয়, ওরাই ভারতের ভবিষ্যতের নির্মাতা অমিতাভ চক্রবর্তী	৮
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১০০ দিন সুদীপ্ত গুহ	১০
চিরকুটের চাকরি থেকে স্বচ্ছ নিয়োগঃ বাংলার শিক্ষায় পরিবর্তনের পাঁচ অধ্যায় অভিরূপ ঘোষ	১২
হিন্দু জাতীয়তাবাদের জনক ঋষি রাজনারায়ণ বসু-র ২০০তম জন্মবার্ষিকী অধ্যাপক ড. অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫
ছবিতে খবর	১৮
দীনদয়াল উপাধ্যায়ঃ সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ, একাত্ম মানবতা ও ভারত নির্মাণের এক স্বপ্নদ্রষ্টা সৌভিক দত্ত	২৪
এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল, ২০২৬ বিদেশি টাকার দালালদের বিরুদ্ধে ভারতের চূড়ান্ত যুদ্ধ দীপল বিশ্বাস	২৮
ব্রিকস সম্মেলন ও মোদীর নেতৃত্বে ভারত বিনয়ভূষণ দাশ	৩২

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অধ্যাপক ড. অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ

সম্পাদকমণ্ডলী:

অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, শুভজিৎ আওন, অনিকেত মহাপাত্র

সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়



সেই যে জীবনানন্দ দাশ লিখলেন, “চোখ না এড়ায়ে তবু
অকস্মাৎ কখনো ভোরের জনান্তিকে/ চোখে থেকে যায়/
আরো-এক আভা...না না, এ চোখ সে চোখ নয়। এ চোখে আভা নয়,
দাগ রয়ে যায়। হেরে যাওয়ার দাগ। নিষ্ফলা আক্রোশের দাগ।
স্বঘোষিত জমিদারের নিষ্ঠুর অত্যাচারে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া
সাধারণ গৃহস্থ মানুষের অভিশাপের দাগ। পচা বাঁশের মাচা যেমন
হুড়মুড়িয়ে পড়ে ঠিক তেমনই মুখ খুবড়ে পড়ার দাগ। এ দাগ যতদিন
থাকবে ততদিন সন্দেহখালির মা-বোনদের বুকের আগুন নিভবে
না। আর তাঁরা যতদিন চোখে চোখ রেখে জবাব চাইবে অত্যাচারের
ওই চোখের দাগও মিটবে না।

১৫ বছর তো কম কথা নয় হে অহঙ্কারী যুবক। সে সময় কোথায়
ছিল তোমার চোখ? চোখে পড়েনি অধর্মের অন্তহীন বিবরণ? কোথায়
ছিলে যখন কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় নির্মম
হামলা চলেছিল? যখন মা কালীকে তোলা হচ্ছিল প্রিজন ভ্যানে?
যখন একের পর এক জনসভায় হুমকি দেওয়া হচ্ছিল দেশের
প্রধানমন্ত্রীকে? যখন তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু
অধিকারীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার চেষ্টা হয়েছিল? যখন আরজিকর-
এ বেমক্লা খুন হয়ে গিয়েছিল অভয়া? যখন মুড়িমুড়কির মত খুন
হয়েছে বিজেপির কর্মীরা? পরিবারের চোখের সামনে যখন বিজেপি
করার অপরাধে মা-বোনেরা চূড়ান্ত লাঞ্ছিত হয়েছিল?

সময় তো অবহেলায় বয়ে গেছে হে অহঙ্কারী দুর্যোধন! এখন যদি
বল-

“তোমাকে দেখার মতো চোখ নেই— তবু,

গভীর বিস্ময়ে আমি টের পাই— তুমি

আজো এই পৃথিবীতে রয়েছে।

কোথাও সান্ত্বনা নেই পৃথিবীতে আজ;

বহুদিন থেকে শান্তি নেই।

নীড় নেই

পাখিরো মতন কোনো হৃদয়ের তরো...” তাহলে কেউ কি
শুনবে তোমার কথা? ডাকবে তোমাকে কাছে? ললাটে ঐক্য দেবে
স্নেহচুম্বন?

আসলে কি জানো হে দুর্যোধন, চোখে কেউ দেখেনা। দেখায় সবই
তাঁর মাথা। মাথায় লালসা থাকলে সন্দেহখালিতে 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ'।
মাথায় অহঙ্কার থাকলে শ্রীরামের নামে ফতোয়া। এসবই যেমন সত্য
ঠিক তেমনই অর্জুনের ভয়ানক গাণ্ডীব, শ্রী হনুমান গৌসাই-এর
লঙ্কাদহন এবং অপ্রতিরোধ্য রাম রথও সত্য। চোখ নিয়ে ভেবোনা
দুর্যোধন। আগে মাথার পচনে বাঁধ দাও। লালসা-হিংসার বদলে মাথায়
সবুজের চাষ করা। তবে না ঈশ্বরের কাছে আকুতি জানাবে- “উদ্ভিদের
মতো জন্ম মৃত্যুহীন / পাতা ও পল্লব দেখতে দেখতে- / আমার
চোখের দরকার, / আমার চোখের সবুজের ভীষণ দরকার!”

'সেবা সংকল্প অভিযান' নিয়ে দেশবাসীর কাছে অমিত শাহের আহ্বান

একজন মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিরবচ্ছিন্ন ২৫ বছরের জনসেবা—এটি শুধু একটি ব্যক্তির রাজনৈতিক যাত্রা নয়, এটি ভারতের পরিবর্তনের ২৫ বছরের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়া। এই ২৫ বছরের সেবা, সংকল্প ও সমর্পণকে স্মরণ করতেই ভারতীয় জনতা পার্টি, এনডিএ-র সহযোগী দল এবং বিভিন্ন সামাজিক ও স্বৈচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে মিলে দেশজুড়ে 'সেবা সংকল্প অভিযান'।

আমরা বিশ্বাস করি, মানুষের সেবা করাই ঈশ্বরের সেবা। রাজনীতি যদি মানুষের জীবনে পরিবর্তন না আনে, যদি দরিদ্রের মুখে হাসি না ফোটায়ে, যদি যুবকের হাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ না দেয়, যদি কৃষকের জীবনকে নিরাপদ না করে—তাহলে সেই রাজনীতির কোনও অর্থ নেই।

নরেন্দ্র মোদীজির ২৫ বছরের রাজনৈতিক জীবন এই সেবার রাজনীতিরই এক দীর্ঘ অধ্যায়া।

২০০১ সালে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল। তারপর ২০১৪ সালে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আজ ২৫ বছর পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি—ভারত একটি নতুন আত্মবিশ্বাস নিয়ে বিশ্বের সামনে দাঁড়িয়েছে।

আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই—২০১৪ সালের আগে ভারতীয় রাজনীতি তিনটি বড় সমস্যায় আক্রান্ত ছিল—দুর্নীতি, জাতপাতের রাজনীতি এবং পরিবারতন্ত্র।

মোদীজির নেতৃত্বে ভারত সেই রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে 'পারফরম্যান্স পলিটিক্স' বা কাজ করে দেখানোর রাজনীতির পথে এগিয়েছে। আজ সরকারের মূল্যায়ন হচ্ছে—সরকার কী কাজ করেছে, মানুষের জীবনে কী পরিবর্তন এনেছে এবং দেশের উন্নয়নের জন্য কী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মোদীজির নেতৃত্বে সরকার সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পায় না। দেশের স্বার্থে কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহস দেখিয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে পরিকাঠামো, সামাজিক কল্যাণ, সংস্কৃতি, জাতীয় নিরাপত্তা এবং অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আমাদের লক্ষ্য শুধু সরকার দিয়ে উন্নয়ন করা নয়। আমাদের লক্ষ্য—জনভাগীদারির মাধ্যমে উন্নয়ন মানে দেশের উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণ। 'বিকশিত ভারত ২০৪৭' কোনও একটি সরকারের প্রকল্প নয়। এটি ১৪০ কোটিরও বেশি ভারতবাসীর সম্মিলিত সংকল্প। তাই 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর মাধ্যমে আমরা দেশের মানুষের কাছে পৌঁছতে চাই, তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে চাই, তাঁদের প্রত্যাশা জানতে চাই এবং উন্নত ভারতের নির্মাণে তাঁদের অংশীদার করতে চাই।

ভারতের ভবিষ্যৎ আমাদের যুবসমাজের হাতে। তাই এই অভিযানে যুবকদের বিশেষভাবে যুক্ত করা হবে। তাঁদের মধ্যে দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ, সেবার মানসিকতা এবং 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর স্বপ্নকে শক্তিশালী করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা চাই ভারতের যুবক শুধু চাকরি খুঁজবে না—চাকরি সৃষ্টি করবে। শুধু নিজের ভবিষ্যৎ গড়বে না—দেশের ভবিষ্যৎও গড়বে।

নরেন্দ্র মোদীর রাজনৈতিক জীবনকে আমরা তিনটি শব্দে ব্যাখ্যা করতে পারি—সেবা, সমর্পণ এবং সংকল্প। ২৫ বছর আগে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তার লক্ষ্য ছিল মানুষের জীবন পরিবর্তন করা। আজ সেই যাত্রা পৌঁছেছে আরও বড় একটি সংকল্পে—২০৪৭-এর বিকশিত ভারত। 'সেবা সংকল্প অভিযান' সেই অতীতের ২৫ বছরের সাফল্যকে স্মরণ করবে এবং আগামী ভারতের জন্য নতুন সংকল্প গ্রহণ করবে।

বডনগর থেকে বারাণসী—প্রধানমন্ত্রীর জীবনের সঙ্গে যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিকেও এই অভিযানের প্রতীকী কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে আমরা বলতে চাই—জন্মভূমি থেকে কর্মভূমি, ব্যক্তিগত যাত্রা থেকে জাতীয় যাত্রা—এই পথের শেষ লক্ষ্য একটাই, ভারতের উন্নতি।

দেশের মানুষের কাছে আমাদের আহ্বান আমি বিজেপির সমস্ত কার্যকর্তা, এনডিএ-র সহযোগী দল, সামাজিক সংগঠন, স্বৈচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এবং দেশের সাধারণ মানুষের কাছে আহ্বান জানাই—এই 'সেবা সংকল্প অভিযান'-কে শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে দেখবেন না। এটিকে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর একটি সুযোগ হিসেবে নিন। একজন অসুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো একটি গাছ লাগানো রক্তদান করুন। একজন দরিদ্র মানুষের কাছে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিন। একজন ছাত্রকে সাহায্য করুন। একজন যুবককে আত্মনির্ভর হওয়ার পথে উৎসাহ দিন। কারণ দেশের সেবা বড় বড় বক্তৃতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দেশের সেবা শুরু হয় একজন মানুষের পাশে দাঁড়ানো থেকে।

নরেন্দ্র মোদীর ২৫ বছরের সেবা ও সমর্পণকে স্মরণ করে আমরা আজ নতুন সংকল্প নিই—একটি উন্নত ভারত, একটি আত্মনির্ভর ভারত, একটি শক্তিশালী ভারত এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি বিকশিত ভারত গড়ে তুলব।

আসুন, আমরা সবাই সেই সংকল্পে অংশ নিই।

সেবা থেকে সংকল্প।

সংকল্প থেকে জনভাগীদারি।

জনভাগীদারি থেকে বিকশিত ভারত।

ভারত মাতা কি জয়া।

—অমিত শাহ।

এক মাস ব্যাপী 'সেবা সংকল্প অভিযান' বাংলায় বুথ স্তর পর্যন্ত হবে নানা কর্মসূচি

নিউজ ডেস্ক, বঙ্গ কমলবার্তাঃ রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর এবারই প্রথম গেরুয়া বাংলায় পালিত হচ্ছে 'সেবা সংকল্প অভিযান'। কিভাবে এবং কেন এই অভিযান, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজেপি রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, “এই অভিযান কেবল রাজনৈতিক প্রচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং এটিকে সেবাভিত্তিক সামাজিক আন্দোলনের রূপ দেওয়া হবে। 'সেবায় আমার অবদান' কর্মসূচির আওতায় পরিচ্ছন্নতা, দুহুদের সহায়তা, নদী ও জলাশয় পুনরুজ্জীবন, জলসংরক্ষণ এবং বর্জ্য পৃথকীকরণের মতো কাজে সাধারণ মানুষকে যুক্ত করা হবে।

বিজেপি আয়ুস্মান ভারত, অন্নপূর্ণা যোজনা এবং বার্ষিক ভাতা সহ বিভিন্ন প্রকল্পের যোগ্য উপভোক্তাদের পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে”।

‘সেবা সংকল্প অভিযান’ উপলক্ষে বিজেপির এই মেগা কর্মসূচিতে বাংলাকে দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে দেখতে চান পশ্চিমবঙ্গ ডাবল ইঞ্জিন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তার জন্য একটি রুটম্যাপও তিনি ইতিমধ্যেই দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের তৈরি করে দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী কথায়, ‘প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনের এই সেবা সংকল্প অভিযান কর্মসূচিতেও পশ্চিমবঙ্গকে দেশের সেরা হতে হবে। যোগ দিবস থেকে শুরু করে তেরঙ্গা অভিযানেও পশ্চিমবঙ্গের স্থান উপরে ছিল। এই সেবা সংকল্প অভিযান কর্মসূচিকে সফল করতে সরকার ও পাটি মিলিতভাবে কাজ করবে।’

১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত এই এক মাস ব্যাপী কর্মসূচির মধ্যে থাকছে— ‘আশীর্বাদের আলো’, ‘২৫ কোটি শিশুর স্বপ্নের ভারত’, ‘আঙিনার উৎসব’, ‘পরিবর্তনের গল্প’, ‘সেবা জ্যোতি যাত্রা’, ‘সেবাই আমার অবদান’, ‘নমো সেবা গাথা’, ‘রঙ্গোলি নেশন’, ‘জাতীয় উদ্ভাবন চ্যালেঞ্জ’, ‘সার্ভিস ব্রিজ ক্যাম্পেইন- আপনার দোড়গোড়ায় সরকার।’

সেবা সংকল্প অভিযান নিয়ে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী শ্রী স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, “২০১৪ সালের মে মাস থেকে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ পথ চলায় ভারতের অর্থনীতি ও পরিকাঠামোয় যে বিরাট পরিবর্তন এসেছে, তা তুলে ধরাই এই অভিযানের মূল প্রেক্ষাপট। ২০১৪ সালের অস্থায়ী ও ভঙ্গুর পরিস্থিতি থেকে ভারত আজ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়েছে। রেলের টিকিট কাটা থেকে শুরু করে কর ব্যবস্থার সরলীকরণ— সর্বত্রই ২০১৪ ও ২০২৬-এর ভারতের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ রয়েছে এবং এই উন্নয়নের নেপথ্যে রয়েছে মোদীর ব্যক্তিগত নেতৃত্ব।

এই এক মাসব্যাপী কর্মসূচিতে মোট তেরোটি ভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কেক কাটা বা মিষ্টি বিতরণের মতো সাধারণ উদযাপনের পাশাপাশি বিভিন্ন বিশেষ কর্মসূচি থাকছে।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সম্মান: সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বিশেষ সম্মান জানানো হবে।

সেবা সম্পর্ক যাত্রা: সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর জন্য এই যাত্রা সংগঠিত হবে।

বিকশিত ভারত যাত্রা: ২০১৪ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত ভারত কীভাবে প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে, তা এই যাত্রার মাধ্যমে তুলে ধরা হবে।

এছাড়াও কলকাতা সহ পাঁচটি শহরে ‘বিজ্ঞান কংগ্রেস’ আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্প থেকে লাভবান হয়েছেন—এমন ২৫ লক্ষ পরিবারের সাফল্যের গল্প সংগ্রহ করে তা প্রচার করার পরিকল্পনাও করেছে বিজেপি। এই পরিবারগুলির অভিজ্ঞতা এবং তাঁদের জীবনে আসা পরিবর্তনের কথা সামাজিক মাধ্যম ও গণমাধ্যমের সাহায্যে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।

সেবা সংকল্প অভিযান

সেবা, অন্ত্যোদয়, রাষ্ট্রভাবনা ও 'বিকশিত ভারত'-এর রাজনৈতিক দর্শন

জয়ন্ত গুহ

মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর নিরবচ্ছিন্ন ২৫ বছরের প্রশাসনিক যাত্রা শুধু একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক অধ্যায় নয়—এই যাত্রা জনসেবা, সুশাসন, অন্ত্যোদয় ও উন্নয়নের এক ধারাবাহিক যাত্রাপথ। ২০২৬-এর 'সেবা সংকল্প অভিযান' সেই ২৫ বছরের অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে আগামী ভারতের জন্য নতুন সংকল্প গ্রহণের আহ্বান।

২০২৬ সাল ভারতীয় রাজনীতিতে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বছর। এ বছরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিরবচ্ছিন্ন প্রশাসনিক কার্যকালের ২৫ বছর পূর্ণ হচ্ছে। ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে যে প্রশাসনিক যাত্রার সূচনা, তা ২০২৬-এ এক বিরল রাজনৈতিক ধারাবাহিকতার ২৫ বছর পূর্ণ করছে। এই ঐতিহাসিক মাইলফলকে সামনে রেখেই দেশজুড়ে 'সেবা সংকল্প অভিযান' পালন করার সিদ্ধান্ত ভারতীয় জনতা পাটিরা।

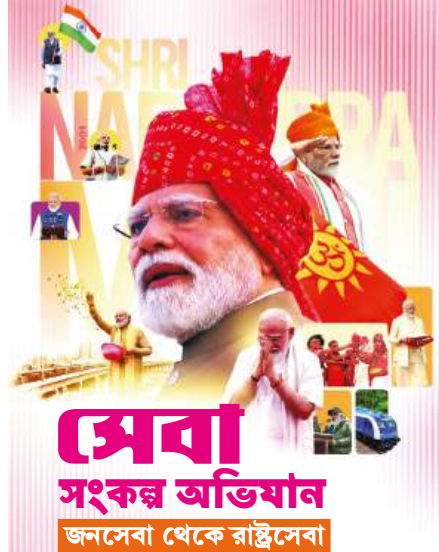
১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন থেকে এক মাস ব্যাপী 'সেবা সংকল্প অভিযান' শুরু হলেও এই অভিযান কিন্তু নিছক কোনও জন্মদিনকেন্দ্রিক কর্মসূচি নয়। এই অভিযান নরেন্দ্র মোদীর ২৫ বছরের নিরবচ্ছিন্ন প্রশাসনিক ও জনসেবার যাত্রাকে মূল্যায়ন, স্মরণ এবং ভবিষ্যতের 'বিকশিত ভারত'-এর সংকল্পের সঙ্গে যুক্ত করার একটি বৃহৎ সাংগঠনিক উদ্যোগ।

শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নিরবচ্ছিন্ন কার্যকালের ২৫ বছরের ধারাবাহিকতাকে তিনটি পর্যায়ে আমরা দেখতে পারি—গুজরাটে প্রশাসনিক নেতৃত্ব, ভারত সরকারের নেতৃত্ব এবং ২০১৪-এর বিকশিত ভারতের লক্ষ্য। ২০০১ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এবং ২০১৪ থেকে ২০২৬ পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোদীর রাজনৈতিক-প্রশাসনিক যাত্রা একই ধারায় অব্যাহত রয়েছে। সেই অর্থে 'সেবা সংকল্প অভিযান' '২৫ বছরের সেবা থেকে আগামী ভারতের সংকল্প'-এর রাজনৈতিক আখ্যান।

২৫ বছর সেবার অভিজ্ঞতা—আগামী

ভারতের জন্য নতুন সংকল্প

এই অভিযানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দীর্ঘ প্রশাসনিক জীবনের সাফল্যকে শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক



রাজনৈতিক প্রচারণা করে সমাজসেবা, অন্ত্যোদয়, সংগঠন এবং রাষ্ট্রনির্মাণের বৃহত্তর দর্শনের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

সহজ কথায়, নরেন্দ্র মোদীর ২৫ বছরের প্রশাসনিক যাত্রা কেবল অতীতের হিসাব নয়; বরং আগামী দিনের জন্য একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকল্পের ভিত্তি। 'সেবা সংকল্প অভিযান ২০২৬'-এর লক্ষ্য ২৫ বছরের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাকে ২০৪৭-এর 'বিকশিত ভারত'-এর দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত করা।

অভিযানের মূল লক্ষ্য

অভিযানের মাধ্যমে বিজেপি মূলত 'সেবা, জনসংযোগ ও জনকল্যাণ'—এই তিনটি বিষয়কে সামনে আনতে চাইছে। পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে বুথ থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বাড়ানো বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে—

পরিচ্ছন্নতা অভিযান

রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির

বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ কর্মসূচি

বিভিন্ন কেন্দ্রীয় জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের তথ্য ও সুবিধা পৌঁছে দেওয়া

প্রবীণদের পেনশনসহ বিভিন্ন পরিষেবা পেতে ডিজিটাল সহায়তা

মহিলা, যুব ও প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে বিশেষ জনসংযোগ

'সেবা জ্যোতি যাত্রা' ও 'সেবা সেতু অভিযান'

মোদীর ২৫ বছরের প্রশাসনিক যাত্রা নিয়ে ডিজিটাল/আলোকচিত্র প্রদর্শনী

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জনকল্যাণমূলক কাজের প্রচারা

সেবা থেকে সংগঠন, জনসংযোগ থেকে জনআস্থা—২০২৬-এর

'সেবা সংকল্প অভিযান'কে বাংলায় মানুষের কাছে পৌঁছানোর বৃহৎ কর্মসূচি হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস ভারতীয় জনতা পাটিরা।

সেবা সংকল্প এবং শ্রী দীনদয়াল উপাধ্যায়-এর দর্শন

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের রাজনৈতিক চিন্তার কেন্দ্রে ছিল অন্ত্যোদয়—সমাজের সর্বশেষ, সবচেয়ে দুর্বল মানুষের উন্নয়ন। তাঁর কাছে রাষ্ট্রের উন্নয়নের প্রকৃত মানদণ্ড শুধু সামগ্রিক সমৃদ্ধি নয়; বরং সেই উন্নয়নের সুফল সমাজের শেষ ব্যক্তিটির কাছে পৌঁছেছে কি না।

সেই দৃষ্টিকোণ থেকে 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এ গৃহীত কর্মসূচি যেমন স্বাস্থ্য শিবির, রক্তদান, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের সহায়তা, সরকারি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা এবং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ আসলে অন্ত্যোদয়ের বাস্তব প্রয়োগ।

'জনসেবা থেকে দেশসেবা'-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির জীবনের মূল লক্ষ্য। তিনি যখন দেশের নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন দেশ নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় তিনি দেশহিতের কথা মাথায় রেখে একাধিক নতুন নীতি প্রণয়ন করেন, নতুন কর্মসূচি শুরু করেন এবং এমন বহু প্রকল্প বাস্তবায়িত করেন, যা সাধারণ মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে।

'স্টার্টআপ ইন্ডিয়া' তরুণদের আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার সুযোগ তৈরি করেছে। শৌচাগার নির্মাণের মাধ্যমে মহিলারা পেয়েছেন সম্মান ও মর্যাদা। অন্যদিকে, 'লাখপতি দিদি' প্রকল্প মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর ও শক্তিশালী করে তুলেছে। আজ আমাদের মহিলারা আত্মনির্ভর হয়ে দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন।

দীর্ঘ সময় ধরে দেশকে নকশালবাদের অভিশাপ সহ্য করতে হয়েছে। একসময় ২০০-রও বেশি জেলায় নকশালবাদের শিকড় ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু আজ ভারত নকশালবাদের বিরুদ্ধে নির্ণায়ক সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। একইভাবে, দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসবাদেরও শিকার হয়েছে দেশ। তবে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদকে তার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হয়েছে। আজ আমাদের সীমান্ত আরও সুরক্ষিত এবং দেশের দিকে কুদৃষ্টি দেওয়া শক্তিগুলিকে দেওয়া হয় যোগ্য জবাব।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির উন্নয়নের লক্ষ্যের প্রতি দেশের মানুষের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেব।

—নীতিন নবীন, রাষ্ট্রীয় সভাপতি, ভারতীয় জনতা পার্টি

“প্রধানমন্ত্রী মোদী কোনো রাজবংশ বা উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা পাননি। তাঁর এই দীর্ঘ সফর মূলত কঠোর ত্যাগ, সাধনা, দেশের জন্য কিছু করার গভীর ইচ্ছা এবং ধারাবাহিক সংগ্রামের ফল। বিগত বছরগুলোতে পরিকাঠামো উন্নয়ন, যুগান্তকারী নীতি সংস্কার এবং বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের কারণে দেশের কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেয়েছেন। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সর্দার সরোবর প্রকল্প এবং পানীয় জলের সুবিধা থেকে শুরু করে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে মোদী যে রূপান্তর এনেছিলেন, তা আজ সমগ্র ভারতের একটি সফল 'উন্নয়ন মডেলে' পরিণত হয়েছে”।

—যোগী আদিত্যনাথ, মুখ্যমন্ত্রী, উত্তরপ্রদেশ।

শ্রদ্ধেয় শ্রী দীনদয়াল উপাধ্যায় রাজনীতিকে কেবল ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতা হিসেবে দেখেননি। তাঁর চিন্তায় রাজনীতির চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ। সেই অর্থে 'সেবা সংকল্প' একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা।

নির্বাচনের সময় শুধু মানুষের কাছে যাওয়া নয়, সারা বছর মানুষের পাশে থাকা এটাই বিজেপির রাজনৈতিক দর্শন। সংগঠনকে শুধু নির্বাচনী মেশিনারি হিসেবে না দেখে সামাজিক দায়িত্বের বাহক হিসেবে প্রতিষ্ঠার সংকল্পই 'সেবা সংকল্প অভিযান'।

দীনদয়াল জী-র একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল—উন্নয়নের আলো সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা মানুষের কাছে পৌঁছেছে কি না। নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়নের ভাষায় যাকে আমরা বলছি 'সবার সঙ্গে, সবার বিকাশ'। আর সেই সেবা সংকল্পের পথেই 'বিকশিত ভারত'। যা কেবল বড় শহর, শিল্প, প্রযুক্তি বা পরিকাঠামোর ভারত নয়; গ্রামের কৃষক, শ্রমিক, দরিদ্র পরিবার, প্রবীণ, মহিলা, যুবক এবং সমাজের প্রান্তিক মানুষের উন্নতিও তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। দীনদয়াল জীর কাছে রাজনীতির সার্থকতা ছিল সমাজের শেষ মানুষের মুখে হাসি ফোটানোয়। 'সেবা সংকল্প অভিযান' সেই দর্শনকে ২০২৬-এর রাজনৈতিক ভাষায় পুনরায় প্রকাশ করার একটি প্রচেষ্টা। যেখানে সেবা শুধু মানবিক কর্তব্য নয়, রাষ্ট্রনির্মাণেরও ভিত্তি।

এককথায়, 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর তাৎপর্য হল—উন্নয়নকে শুধু পরিসংখ্যানের মধ্যে বেঁধে না রেখে মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত করা। মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর নিরবচ্ছিন্ন ২৫ বছরের প্রশাসনিক যাত্রা শুধু একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক অধ্যায় নয়—এই যাত্রা জনসেবা, সুশাসন, অন্ত্যোদয় ও উন্নয়নের এক ধারাবাহিক যাত্রাপথ। ২০২৬-এর 'সেবা সংকল্প অভিযান' সেই ২৫ বছরের অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে আগামী ভারতের জন্য নতুন সংকল্প গ্রহণের আহ্বান।

আজকের প্রজন্ম ‘জেন-জি’ নয়, ওরাই ভারতের ভবিষ্যতের নির্মাতা

আজকের যুব সমাজকে শুধু ভবিষ্যত ভারতের নাগরিক হিসেবে নয়, আজকের সমাজের অংশীদার হিসেবেও দেখতে হবে। দিশা দেখালেন শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন), ভারতীয় জনতা পাটি।



অমিতাভ চক্রবর্তী

আজকের প্রজন্মকে আমরা খুব সহজেই বলে দিই— “এরা তো Gen-Z!” মোবাইল, সোশ্যাল মিডিয়া, বদলে যাওয়া জীবনযাপন, নতুন মূল্যবোধ— সবকিছু দেখেই আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি। মনে হয়, আগের প্রজন্মের মতো আর নেই তারা। কিন্তু একবারও কি আমরা নিজেদের প্রশ্ন করেছি— যে সন্তানদের হাতে আমরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ তুলে দিতে চাই, তাদের সঙ্গে আমাদের এতটা দূরত্ব তৈরি হল কীভাবে?

তাদের শুধুই সমালোচনা করার বদলে যদি আমরা শুনতে শিখি, উপদেশ দেওয়ার আগে যদি বোঝার চেষ্টা করি, আর প্রজন্মের ব্যবধানকে দেওয়াল না বানিয়ে সেতু তৈরি করি— তাহলেই হয়তো বদল আসবে। কারণ— Gen-Z সমস্যা নয়। Gen-Z-কে না-বোঝাটাই সমস্যা।

সমস্যা যুবসমাজ নয়, সমস্যা অনেক সময় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি

আমরা খুব সহজেই বলি— “ওরা সারাক্ষণ মোবাইলে ডুবে আছে।” “ওদের ধৈর্য নেই।” “ওরা আমাদের মতো নয়।” “আজকের ছেলেমেয়েরা কিছু বোঝে না।” কিন্তু একবারও কি আমরা নিজেদের প্রশ্ন করি— মোবাইলের পাশাপাশি আমরা তাদের হাতে কী তুলে দিয়েছি? বই দিয়েছি কি? ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছি কি? বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের গল্প শুনিয়েছি কি? নাকি দিয়েছি শুধু নিয়ম,

নিষেধ আর উপদেশ? কখনও কি ভেবে দেখেছি, মোবাইলের বাইরের পৃথিবীটা আমরা তাদের কতটা সুন্দর করে দেখিয়েছি? খাবার টেবিলে কি আমরা নিজেরাই মোবাইল সরিয়ে তাদের সঙ্গে গল্প করি? তাদের কি শিকড়ের গল্প, দাদু-ঠাকুরমার স্মৃতি, মাটির সোদা গন্ধ আর মাতৃভাষার মাধুর্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছি? নাকি তাদের হাতে প্রযুক্তি তুলে দিয়ে ধরে নিয়েছি যে মূল্যবোধও তারা আপনাপনি শিখে নেবে?

সময় বদলাবে, ভাষা বদলাবে, প্রযুক্তি বদলাবে, জীবনযাত্রা বদলাবে। কিন্তু মানুষের ভিতরের কিছু আকাজক্ষা বদলায় না

তরুণ সমাজকে কিভাবে দেখতেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি?

প্রায় একই ভাবনার প্রতিফলন আমরা দেখি শিক্ষাবিদ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির কথা। “Gen-Z” শব্দটি তিনি ব্যবহার করেননি। কিন্তু ছাত্র-যুবসমাজ, শিক্ষা, চরিত্রগঠন, আত্মনির্ভরতা, জাতীয় দায়িত্ব এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিয়ে তাঁর বক্তব্য আজকের প্রজন্মের প্রসঙ্গেও প্রাসঙ্গিক। তখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। ১৯৩৫ সালের ৭ ডিসেম্বর কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে তরুণদের

উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, তাঁদের এমনভাবে নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে যাতে জীবনের কঠিন সংগ্রামের মোকাবিলা করতে পারেন। তিনি বিশেষভাবে সতর্ক করেছিলেন যে শুধু অতীতের সাফল্য নিয়ে গর্ব করলে চলবে না; পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে নিজেদের দক্ষতা ও যোগ্যতা বাড়াতে হবে। তরুণদের সামনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন যে কিছু ছাত্র নগদ পুরস্কারের পরিবর্তে বইকে পুরস্কার হিসেবে বেছে নিয়েছিল— এবং তিনি এই প্রবণতাকে প্রশংসনীয় বলে মনে করেছিলেন। আজকের মোবাইল-নির্ভর যুগে শ্যামাপ্রসাদের ভাবনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা কি ভাবতে পারি না যে প্রযুক্তি থেকে যুবসমাজকে সরিয়ে দেওয়া নয়; প্রযুক্তির পাশাপাশি জ্ঞান, বই, ইতিহাস ও চিন্তার জগতের সঙ্গে তাদের যুক্ত করা? ডঃ মুখার্জির এই বক্তৃতার শিরোনাম ছিল “Speech by Mr. Syama Prasad Mookerjee, Vice-Chancellor, Calcutta University, at Scottish Church College on 7th December, 1935.” শ্যামাপ্রসাদের কাছে নতুন প্রজন্ম সমস্যা ছিল না; নতুন প্রজন্মকে সঠিক শিক্ষা, চরিত্র, দক্ষতা ও জাতীয় দায়িত্ববোধে গড়ে তোলাই ছিল ভবিষ্যৎ নির্মাণের পথ। একটা প্রজন্মকে শুধু বলা যায় না— “আমাদের মতো হওয়া” কারণ তারা আমাদের সময়ে বড় হয়নি। তারা বড় হয়েছে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন পৃথিবীতে। তাই তাদের প্রশ্নকে ভয় পাওয়ার দরকার নেই। তাদের প্রশ্নকে স্বাগত জানাতে হবে।

আমাদের অভিযোগ—তারা

প্রশ্ন করে বেশি

কিন্তু প্রশ্ন করা কি অপরাধ? বরং যে প্রজন্ম প্রশ্ন করে, তার মধ্যেই তো নতুন কিছু ভাবার সম্ভাবনা থাকে। তাই তাদের প্রশ্নকে ভয় নয়, স্বাগত জানাতে হবে। “আমাদের সময়ে এমন ছিল না”—এই কথার বদলে

তাদের পাশে বসে বলা দরকার— “বলো, আমি শুনছি।” কারণ সংস্কার বক্তৃতায় তৈরি হয় না। সংস্কার তৈরি হয় সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। একজন বাবা-মা, শিক্ষক কিংবা অভিভাবক যখন একজন তরুণের কথা মন দিয়ে শোনে, তখন শুধু একটি কথোপকথন হয় না—দুটি প্রজন্মের মধ্যে একটি সেতু তৈরি হয়। সেই সেতুটাই আজ সবচেয়ে বেশি দরকার। দূরত্ব নয়, সংলাপ চাই।

প্রজন্ম বদলাবে—এটাই স্বাভাবিক

সময় বদলাবে, ভাষা বদলাবে, প্রযুক্তি বদলাবে, জীবনযাত্রা বদলাবে। কিন্তু মানুষের ভিতরের কিছু আকাঙ্ক্ষা বদলায় না—ভালোবাসা, সম্মান, স্বপ্ন, স্বীকৃতি পাওয়ার ইচ্ছা এবং নিজের মতো করে পৃথিবীকে একটু ভালো করার আকাঙ্ক্ষা। আজকের Gen-Z-ও তার ব্যতিক্রম নয়। তাদের পৃথিবী আমাদের পৃথিবীর মতো নয়। তারা এমন এক সময়ে বড় হয়েছে, যেখানে পৃথিবী তাদের হাতের মুঠোয়। তথ্যের জন্য লাইব্রেরিতে যেতে হয় না; কয়েক সেকেন্ডেই পৃথিবীর যেকোনও প্রান্তের খবর তাদের সামনে এসে যায়। বন্ধুত্বের সংজ্ঞা বদলেছে, কাজের ধরন বদলেছে, শেখার পদ্ধতি বদলেছে, এমনকি স্বপ্ন দেখার ভাষাটাও বদলেছে। তাই তাদের বুঝতে হলে শুধু তাদের আচরণ দেখলে হবে না। তাদের পৃথিবীটাকেও বুঝতে হবে।

শাসন নয়, সঠিক দিশা চাই

আজকের তরুণদের শুধু বলতে হবে না কী করা উচিত; তাদের সঙ্গে বসে আলোচনা করতে হবে কেন করা উচিত। শুধু ভুল ধরিয়ে দিলে হবে না; ভুল থেকে শেখার সুযোগও দিতে হবে। শুধু অতীতের গৌরবের কথা বললে হবে না; সেই অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্রটাও তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। কারণ শিকড় মানে অতীতে আটকে থাকা নয়। শিকড় মানে শক্তি নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

আজ তাদের হাতে মোবাইল, আগামীকাল তাদের হাতেই থাকবে ভারতা

তাই তাদের নিয়ে শুধু অভিযোগ নয়— তাদের সঙ্গে আলাপ করুন। শুধু নির্দেশ নয়— তাদের দিশা দেখান। শুধু ভুল ধরবেন না— তাদের সম্ভাবনাকে চিনুন। কারণ একটি প্রজন্মকে দূরে ঠেলে দিয়ে কখনও শক্তিশালী ভবিষ্যৎ তৈরি করা যায় না। তাদের দূরে নয়, পাশে নিয়ে চলুন। সংস্কার বক্তৃতায় তৈরি হয় না। সংস্কার তৈরি হয় সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। “আমাদের সময়ে এমন ছিল না”— এই কথাটা না বলে, তাদের পাশে বসে শুধু বলতে হবে— “বলো... আমি শুনছি।” হয়তো সেই একটি বাক্যই দুই প্রজন্মের মাঝের দূরত্বটা কমিয়ে দিতে পারে।

তরুণ সমাজকে নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনা

২০ জুন ১৮৯৭ — আলমোড়া থেকে ভগিনী নিবেদিতা-কে তিনি লিখছেন যে তিনি তাঁর নিজের গুরুদের কাছ থেকে যে পদ্ধতিতে শিক্ষা পেয়েছিলেন, সেইভাবেই কাজ শুরু করেছেন—প্রাতিষ্ঠানিক আরাম-আয়েশের বদলে অত্যন্ত সাধারণ পরিবেশে। এরপর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন: “I have sent some of my boys to work in the famine districts.” অর্থাৎ, তিনি তাঁর কয়েকজন তরুণ শিষ্য/সহকর্মীকে দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে কাজ করতে পাঠিয়েছিলেন। তিনি লিখছেন, এই কাজের প্রভাব ছিল অসাধারণ। তাঁর উপলব্ধি ছিল—মানুষের হৃদয়ে পৌঁছতে হলে শুধু বক্তৃতা বা তত্ত্ব দিয়ে হবে না; সেবার মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আর সেই কাজে দেশের তরুণ সমাজকেই তিনি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ওই চিঠিতেই তিনি বলছেন, “the present plan is, therefore, to train up numbers of young men...” অর্থাৎ তাঁর পরিকল্পনা ছিল একদল তরুণকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করা। কিন্তু প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য কি ছিল?

তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই তরুণদের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হবে। তাঁরা প্রথমে মানুষের মধ্যে কাজ করবেন, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করবেন, বাস্তব সমস্যার মোকাবিলা করবেন। তারপর যখন সেই সামাজিক জমি প্রস্তুত হবে, তখন দর্শন ও তত্ত্বের আলোচনা করা যাবে।

পরবর্তীতে, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৭, শ্রীনগর থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দ-কে লেখা আরেকটি চিঠিতে তিনি প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য আরও পরিষ্কার করেন। সেখানে তিনি বলছেন, শুধু শিক্ষিত হওয়াই যথেষ্ট নয়; দরকার চরিত্র নির্মাণ। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হবে তাদের বিশ্বস্ত এবং ভয়মুক্ত করে তোলা এবং পদ্ধতি হবে—প্রথমে দরিদ্রদের শারীরিকভাবে সাহায্য করা, তারপর তাদের মানসিক ও উচ্চতর উন্নতির দিকে এগোনো।

স্বামী বিবেকানন্দের যুব-ভাবনার কেন্দ্রে ছিল একটি গভীর বিশ্বাস—তরুণদের মধ্যে অসীম শক্তি ও সম্ভাবনা রয়েছে। সেই শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে, চরিত্র ও সাহসে গড়ে তুলতে হবে এবং মানুষের সেবায় নিয়োজিত করতে হবে।

শিকড়ের টানে, স্বপ্নের ডানায়—আজকের 'ওরা'ই আগামীর 'আমরা'

যাদের হাতে আমরা ভবিষ্যতের ভারতকে দেখতে চাই, যাদের চোখে নতুন স্বপ্নের আলো, যাদের মেধা, সাহস ও সৃজনশীলতার উপর আগামী দিনের সমাজ দাঁড়িয়ে থাকবে—তাদের কি শুধুই মোবাইল, সোশ্যাল মিডিয়া আর বদলে যাওয়া জীবনযাত্রার মাপকাঠিতে বিচার করা যায়? এই প্রজন্ম শুধু রিল বানায় না, রেকর্ডও গড়ে। তারা প্রযুক্তির নতুন দিগন্ত খুলছে, বিজ্ঞান ও গবেষণায় এগিয়ে যাচ্ছে, ক্রীড়াক্ষেত্রে তেরঙ্গা উড়িয়ে দিচ্ছে। তারাই বর্তমান সময়ের যুব ভারত। আজ তাদের সময় দিন, শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত করুন, স্বপ্ন দেখতে শেখান, আগামীকাল তারাই গড়বে শক্তিশালী, আত্মবিশ্বাসী ও গৌরবময় ভারত।
নমস্কার, বন্দেমাতরম।



পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১০০ দিন

সুদীপ্ত গুহ

রাজ্যে কল্যাণী, অভাল, কলাইকুন্ডা, কোচবিহার এবং বালুরঘাটে বিমাননগরী বানানো হবে। কোন খবর নেই। রাজ্য সরকার ক্ষমতায় এসে লুধিয়ানা এবং সুরাট থেকে আসা পণ্যবাহী রেল করিডোরকে সবুজ সংকেত দিয়েছে। কোন খবর নেই। আনন্দের-বাজারে শুধু ডিমবাহিনী নিয়ে রোজ খবর কিংবা কোন ফচকে বামপন্থী নেতা কোথায় কি মন্তব্য করলো সেটা হেডলাইন।

বাং বাংলার মিডিয়া গত কয়েক মাসের যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ, তা সম্পূর্ণ চেপে যাচ্ছ। বদলে বিভিন্ন নেতিবাচক খবর বাজারে এনে তিলকে তাল করে মানুষকে খাইয়ে দিচ্ছে এবং মানুষের মনসেদিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে।

অর্জুন সিং দুই ডজন পাট কল খুলেছেন। কোন খবর নেই। অথচ কোন সন্ধ্যাসী আমিষ নিরামিষ নিয়ে কি বলল সেটা খবর। বহু ভালো বাস রাস্তায় নামছে। কোন খবর নেই। অথচ, ডিম ছোড়া নিয়ে রোজ খবর। দুটো বড় স্টিল প্লান্ট এলো। কোন খবর নেই। অথচ, কোন এলাকার কোন গুন্ডা ধরা পড়লো না সেটাকে সেটিং তত্ত্ব দিয়ে খবর বানিয়ে খাওয়ানো। আমূল কারখানা বানানো হল যেখানে বহু মানুষ কাজ পাবে।

কোন খবর নেই। অথচ কোন নায়িকাকে দুর্গাপুজোয় নিজের পাড়ায় আসতে পুজো কমিটি বারণ করেছে সেটা খবর। রাজ্য একের পর এক জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের গ্রিন সিগন্যাল দিচ্ছে। কোন খবর নেই। অথচ কোন ফচকে বামপন্থী নেতা কোথায় কি মন্তব্য করলো সেটা হেডলাইন। পুরুলিয়ার



মানুষ পরিশ্রুত জল পেলা। কোন খবর নেই। কল্যাণী এয়ারপোর্ট পেলা। কোন খবর নেই। ভাগীরথী হুগলীতে জলবন্দর হবে দুই ডজন। কোন খবর নেই। কেরালার পর ভারতে দ্বিতীয় গভীর সমুদ্র বন্দর পশ্চিমবঙ্গ তৈরি করছে। কোন খবর নেই। দুর্গাপুর শিলিগুড়ি মেট্রো রেল পাবে। কোন খবর নেই। দেড় কোটি মহিলা অন্নপূর্ণা ভান্ডার পেলেন। কোন খবর নেই। ২৫০ দাগি ক্রিমিনাল গ্রেপ্তার। কোন খবর নেই।

পশ্চিমবঙ্গে ৯৯% জায়গায় তোলাবাজি বন্ধ। কিন্তু খবর বাকী ১% জায়গা নিয়ে। পশ্চিমবঙ্গে সরকারি স্তরে কাটমানি বন্ধ। কোন খবর নেই। স্কুলে বাচ্চারা ভালো খাবার পেয়ে আবার ফিরে আসছে। কোন খবর নেই। ১০০০০০

নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু কোন খবর নেই। ৩৩% মহিলা সংরক্ষণ কোন খবর নেই। রাজ্যের যে কোনও ছেলেমেয়ে পৃথিবীর সেরা ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেলে ১০০% স্কলারশিপ পাবে কোন খবর নেই। IACS নতুন গবেষণা কেন্দ্র তৈরির জায়গা পেল খবর নেই। রাজ্য নতুন IIT পেলে খবর নেই। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হচ্ছে। কোন খবর নেই। রাজ্যে তেলেঙ্গানা কর্ণাটকের মত GCC পলিসি আসছে। কোন খবর নেই। কলকাতার সঙ্গে সারা ভারতের পণ্যবাহী রেল করিডোরের গ্রীন সিগন্যাল দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কোন খবর নেই।

পঞ্চায়েত নেতাদের সেই করার ক্ষমতা কেড়ে নেতা হয়েছে দুর্নীতি দূর করতে। কোন খবর নেই। এসএসসি দুর্নীতি বন্ধ করতে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের আনা হল এসএসসিতে। কোন খবর নেই। আদিবাসী দরিদ্র ছেলেমেয়েদের জন্যে আবাসিক একলব্য স্কুল জেলায় জেলায় খোলা হচ্ছে। কোন খবর নেই। তপসিলি ছাত্রদের জন্যে UPMP খাঁছে আবাসিক স্কুল হচ্ছে। কোন খবর নেই। নতুন AIIMS আসছে। কোন খবর নেই। বিদ্যুৎ বন্টন ব্যবস্থা মাটির নিচের নিয়ে যাওয়া হবে বহু শহরে এবং গ্রামো কোন খবর নেই। ১০০০ নতুন সঙ্ঘের স্কুল খোলা হবে। কোন খবর নেই। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যে নতুন কোচিং খোলা হবে এবং ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সাহায্য করা হবে। কোন খবর নেই। বহু নদী বন্দর তৈরি করছে রাজ্যে জলপথে ব্যবসা শুরু করতে। কিন্তু কোন খবর নেই।

রাজ্যে কল্যাণী, অভ্যাস, কলাইকুন্ডা, কোচবিহার এবং বালুরঘাটে বিমানগামী বানানো হবে। কোন খবর নেই। রাজ্য সরকার ক্ষমতায় এসে লুখিয়ানা এবং সুরাট থেকে আসা পণ্যবাহী রেল করিডোরকে সবুজ সংকেত



দিয়েছে। কোন খবর নেই। বহু আটকে থাকা রেল প্রকল্পের সবুজ সংকেত দিয়েছে রাজ্যে। কোন খবর নেই। অমৃতসর দিল্লী কলকাতা শিল্প করিডোরে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবেন রাজ্য। কোন খবর নেই। ইস্ট কোস্ট শিল্প করিডোরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘোষণা করেছে রাজ্য। কোন খবর নেই।

আসলে পশ্চিমবঙ্গ উন্নতি করলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্ব হারাবে। তাই হলদিয়া বন্দর তৈরির শান্তি হিসেবে 'আনন্দের-বাজার' সহ সব নকশাল গোষ্ঠী বদনাম করে দেশের সবচেয়ে সং মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের বলি দেন। এবার গভীর সমুদ্র বন্দর তৈরির জন্যে শান্তি দেয়া পরিকল্পনা

শুভেন্দু অধিকারীকে? কারণ ভারতে এমন বন্দর নেই। কেরালার আদানি বন্দর এবং পশ্চিমবঙ্গের এই বন্দর হলে আগামীদিনে শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুরের উপর ভারতের নির্ভরতা কমবে। বাংলাদেশের উপর উত্তর পূর্ব ভারতের নির্ভরতা কমবে। তাই শুভেন্দু অধিকারীকে শাস্তি দেবার জন্যে কুৎসা শুরু। আমরা আপাতত: প্রচারে ব্যর্থ স্বীকার করছি। ঋষিভুল্য মানুষ প্রফুল্ল সেনকে তৎকালীন মিডিয়া চোর বদনাম দিয়ে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেন, যিনি শেষ জীবনে ছাত্রদের কাছে আশ্রয় না পেলে না খেয়ে মরতেন। আর সেই পাপে ধ্বংস হয়ে গেছে পুরো বাংলা পরের কয়েক দশকে। আমরা আবার সেই পাপ করছি না তো আনন্দবাজার গোষ্ঠীর মিথ্যা প্রচারে পা দিয়ে?

বিজেপি সরকারের প্রথম ১০০ দিনের কাজের খতিয়ান

প্রতিক্রিয়া নয়, কাজের মধ্যেই উন্নয়নের পথিচয়

১. ২৪ টা বাক পাটকল খোলা হয়েছে। কর্মসংস্থান হয়েছে ১০০০০+ লোকের।	১১. ২৫০+ দাপ্তরিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে বৈদেশিক এমবাসি পরিদূত।
২. ১০০ ক্যান্টিনে নতুন সরকারি বাস সেলোবে কলকাতার রাস্তায়।	১২. কুলের মিত্র ত্তে মিলে ভালো খাবার দেওয়ার ফলে, কুশুভুতে সংখ্যা কমে গেছে।
৩. ২৫টা মিলি প্লান্ট, ১টা বেসিয়ারি কারখানা এবং আঙ্গুরের কারখানার ডিজিটাইজেশন স্থাপন হয়েছে।	১৩. সরকারি চাকরিতে ১০০০০ লোকের নিয়োগ চালু হয়েছে।
৪. রাজ্যে একের পর এক জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের গ্রীন সিগন্যাল দিচ্ছে।	১৪. রাজ্যের যে কোন জেলের সেরা পৃথিবীর সেরা ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ে সুবাস পেলে ১০০% স্কলারশিপ পাবে।
৫. পুত্রদিয়ার মানুষ পরিশ্রমিত জল পেতে শুরু করলো।	১৫. IACS IACS নতুন গবেষণা কেন্দ্র তৈরির জায়গা পেল।
৬. কন্যাশীতে নতুন আর একটা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট তৈরি হচ্ছে।	১৬. রাজ্যে নতুন IIT তৈরি হচ্ছে।
৭. জাতীয় হাঙ্গারি জলবন্দর হবে, হাঙ্গারিয়ার পর আরো দুটো।	১৭. কলকাতার সঙ্গে সারা ভারতের পণ্যবাহী রেল করিডোরের গ্রীন সিগন্যাল দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
৮. দুর্গাপুর-শিলিগুড়ি মেট্রো রেল চালু হওয়ার গ্রীন সিগন্যাল দিচ্ছে।	১৮. পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হচ্ছে।
৯. কোরাসের পর ভারতে দ্বিতীয় বড় সড়ক বন্দর পশ্চিমবঙ্গ তৈরি করছে।	১৯. জাত্যে তেলেঙ্গানা কর্ণাটকের মত GCC পলিসি আসছে।
১০. লেড কোটিং বেশি মহিলা অল্পবয়সী ভাটার পেয়েছে।	২০. এবার থেকে প্রতি সপ্তাহে বিদ্যুতের বিল আসবে। ফলে বিদ্যুতের বিল সাধারণ হবে।

উন্নত পশ্চিমবঙ্গ, উন্নত ভারত
প্রচারে Abhijit Basak



চিরকুটের চাকরি থেকে স্বচ্ছ নিয়োগ বাংলার শিক্ষায় পরিবর্তনের পাঁচ অধ্যায়

অভিরূপ ঘোষ

শেষ পাঁচ দশকের অপশাসনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হয়ে গেছে পাটি অফিস এবং অধ্যাপকদের একটা বড় অংশ হয়ে গেছে সিপিএম ক্যাডারদের রাজনৈতিক গুরু। বিজেপি ক্ষমতায় এসেই বুঝেছিল, এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের জন্য বদলির আইন এনেছে বিজেপি সরকার। আশা করা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে পাটিতন্ত্র কায়েম হয়েছে, তার চক্রবৃহৎ থেকে খুব দ্রুত বেরিয়ে আসতে পারব আমরা।

শিক্ষা যে কোনও জাতির মেরুদণ্ড। সুপ্রাচীনকাল থেকেই সনাতনীর সব থেকে বেশি যে বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছে, তা হল শিক্ষা। গুরু-শিষ্য পরম্পরার মাহাত্ম্যই একসময় বিশ্বগুরু করেছিল ভারতবর্ষকে। তারপর প্রথমে ইসলামিক আগ্রাসন এবং পরে ইংরেজদের শাসন শিক্ষাগুরু ভারতকে অনেকটা পিছনে টেনে নিয়ে যায়। স্বাধীনতার পর আমাদের হাতে সুযোগ ছিল পুরনো গৌরব ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, দীর্ঘদিনের কংগ্রেস শাসন আমাদের সেই সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করে। ধীরে ধীরে আরও অন্ধকারে তলিয়ে যেতে থাকি আমরা।

এদিকে, আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা হতে থাকে আরও খারাপ। যে রাজ্য জ্ঞান ও মেধার দৌলতে একসময় ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল, সেই মহান রাজ্যই ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে হার্মাদ আর লুপ্তনদের হটস্পট। যথারীতি, এই অবনমনে নেতৃত্ব দেয় বাম আর তৃণমূল। বাম আমলে ৩৪ বছরে একে একে ভয়ংকর আঘাত নেমে আসে শিক্ষার উপর। প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি শিক্ষা তুলে দেওয়া, কম্পিউটার শিক্ষা চালু হতে না দেওয়া, কলেজ-ইউনিভার্সিটিকে ইউনিয়ন রুম বানিয়ে ফেলা, প্রাথমিক শিক্ষার পরিকাঠামো ধ্বংস করে দেওয়া কিংবা সর্বাঙ্গীকৃত শিক্ষা মিশন ও মিড-ডে মিল-সহ একাধিক পদক্ষেপে বাধা সৃষ্টি করার মতো ঘৃণ্য কাজের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে অন্ধকার রাজত্ব চালু করেছিল সিপিএম।

সিপিএমের যোগ্য শিষ্য তৃণমূল সেই নোংরামিকে অব্যাহত রাখে। ১৫ বছর ধরে, শুধু ধরন কিছুটা পাল্টে যায়। সিপিএম আমলে চিরকুটে চাকরি হত, আর তৃণমূল আমলে হত ফাঁকা খাতা। সিপিএম বাজেপেয়িজির স্বপ্নের সর্বাঙ্গীকৃত শিক্ষা মিশনকে আটকে দিয়েছিল, আর তৃণমূল আটকে দেয় নরেন্দ্র মোদিজির স্বপ্নের শিক্ষা পলিসিকে।

প্রথম পরিবর্তন আসে মিড-ডে মিলে। বিজেপি সরকার তার প্রথম বাজেটেই ঘোষণা করে, ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত ছাত্র-পিছু বরাদ্দ ৬ টাকা ৭৮ পয়সা থেকে প্রায় দেড় গুণ বেড়ে হবে ১০ টাকা। এই অতিরিক্ত অর্থ সম্পূর্ণরূপে রাজ্য সরকার নিজেদের কোষাগার থেকে বহন করেছে। পাশাপাশি, মিড-ডে মিল কর্মীদের সাম্মানিকও অনেকটা বাড়ানো হয়। একই সঙ্গে রাজ্যের একটা বড় অংশে মিড-ডে মিল পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় ইসকনকে।

স্বভাবতই, রাজ্য তথা দেশের উন্নয়ন যারা দেখতে পারে না, তারা রে রে করে ওঠে। অভিযোগ ওঠে, এতে করে নাকি মিড-ডে মিল কর্মীদের কাজ চলে যেতে পারে। অভিযোগ ওঠে, এতে করে নাকি রাজ্য সরকার নিরামিষ চালুর চেষ্টা করছে। তবে বাস্তবে দেখা যায়, অন্য আরও অনেক ঘটনার মতো এক্ষেত্রেও বাম, তৃণমূল ও কংগ্রেসের অভিযোগ একশো শতাংশ মিথ্যা। চাকরি কারও যায়নি, ছাত্ররা খুব ভালো খাবার পাচ্ছে ইসকনের কাছ থেকে এবং ডিমও

দেওয়া হচ্ছে নিয়ম মেনে। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক—সবাই খুশি, শুধু বাম-তৃণমূল ছাড়া।

দ্বিতীয় পরিবর্তন এসেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। বাম হোক বা তৃণমূল, স্কুল সার্ভিসের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ চেয়ারম্যান পদটি দখল করে বসে থাকতেন পাটির কোনও নেতা। ফল চোখের সামনে। বাম আমলে চিরকুটে চাকরি আর তৃণমূল আমলে ফাঁকা খাতা জমা দিয়ে চাকরি যেন একটা নিয়ম হয়ে গিয়েছিল। এতে তো যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা বঞ্চিত হতই, তবে সবথেকে বড় ক্ষতি হতো শিক্ষার্থীদের। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের একটা অংশ অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও নিয়োগ পেয়ে যাওয়ায় শিক্ষার মান ধীরে ধীরে তলানিতে ঠেকে যায়।

একই সঙ্গে সমাজে এক গভীর হতাশার জন্ম নেয়। ভালো ছাত্র-ছাত্রীরা অধিকাংশই রাজ্য ছাড়তে আরম্ভ করে এবং যারা থেকে যায়, তারাও শিক্ষক হওয়াটাকে ক্যারিয়ারের শেষ অপশন হিসেবে রেখে দেয়। দু-চারজন যারা এত বাধা অতিক্রম করে আদর্শের টানে শিক্ষক হতেন, তাঁরাও প্রথমে হার্মাদ কমরেড এবং পরবর্তীতে তোলাবাজ



মস্তানদের চক্রের নিজের কাজটাই ঠিকঠাক করতে পারতেন না।

একই অবস্থা ছিল প্রাইমারি স্কুলেও। প্রায় প্রতিটি জেলার প্রাইমারি কাউন্সিলের মাথায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল কোনও দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাকে।

ক্ষমতায় এসেই এই ট্র্যাডিশন বদলে ফেলে বিজেপি। রাজ্যস্তরের প্রাইমারি বোর্ড এবং স্কুল সার্ভিসের মাথায় বসানো হয় অভিজ্ঞ আমলাদের। আর সদস্য করা হয় এমন গুণীজনদের, যাঁদের সততা এবং নিষ্ঠা সম্পর্কে সমাজে কোনও প্রশ্ন উঠতে পারেনা।

নতুন সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ এডুকেশনাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রো-চ্যান্সেলর ও সেক্রেটারি স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ। তিনি ফিজিক্সে পিএইচডি। ২৫ বছর ধরে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির কলেজে ফিজিক্স পড়িয়েছেন।

দ্বিতীয় সদস্য হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুরের সেক্রেটারি স্বামী শান্তজ্ঞানন্দকে। তিনিও ডক্টরেট এবং শেষ ২৯ বছর ধরে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত।

তৃতীয় সদস্য হিসেবে রয়েছেন রামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টি, রামকৃষ্ণ

মিশনের গভর্নিং বডির সদস্য এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের (গোলপার্ক) সচিব স্বামী তত্ত্বসারানন্দ। তিনিও শিক্ষাবিজ্ঞানে পিএইচডি করেছেন এবং শেষ তিন দশক ধরে অধ্যাপনা করে চলেছেন।

চতুর্থ সদস্য হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট, কলকাতার স্ট্র্যাটাজিক ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের অধ্যাপক রাম্যা তারাকাদ ভেঙ্কটেশ্বরনকে। বলার অপেক্ষা রাখে না, ইনিও দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা এবং অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত।

বিজেপিতে শিক্ষিত মানুষের অভাব নেই। বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন নিজেই অত্যন্ত গুণীজন এবং শিক্ষক মানুষ। উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের যোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতাও প্রশ্নের উর্ধ্বে। দুজনেই ভীষণ সং, রাষ্ট্রবাদী, মানবদরদী এবং কর্মযোগী মানুষ।

ভুললে চলবে না, স্বাধীনতার পর সব থেকে বেশি ডাক্তার, আইনজীবী, ইঞ্জিনিয়ার এবং শিক্ষক জিতিয়ে এনেছে এবারের বিজেপি সরকার। এই বিধায়কদের বাইরেও এক বিপুল শিক্ষিত ও সং কর্মী ও সমর্থক মজুদ আছে বিজেপির বুলিতে। ব্যাপক মার্জিনে জয় করে বিজেপি চাইলে সেই গুণীজনদের কাউকে স্কুল সার্ভিস, পাবলিক সার্ভিস বা প্রাইমারি বোর্ডে নিতে পারত। সেই ব্যক্তিদের যোগ্যতা ও সততার জোরে সেটা ভুলও হত না।

কিন্তু বিজেপি সেটা করেনি। কারণ, বিজেপির প্রাথমিক লক্ষ্য শিক্ষাক্ষেত্র থেকে রাজনীতিকে দূরে রাখা এবং শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে এক বিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি করা। আগামী সাড়ে চার বছর নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করে দেবে, দুর্নীতির কোনও জায়গা স্কুল সার্ভিস কমিশন বা প্রাইমারি বোর্ডে নেই।

তৃতীয় পরিবর্তন এসেছে স্কুল এবং কলেজের ম্যানেজমেন্ট স্তরে। এতদিন পর্যন্ত সরকার-মনোনীত পাটির দালালরা স্কুল ম্যানেজিং কমিটির মেম্বর এবং প্রেসিডেন্ট হতা বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরই পাটি কর্মীদের দিয়ে তৈরি সেই ম্যানেজিং কমিটি ভেঙে যায়। না, তারপরে নিজেদের দলের লোকেদের দিয়ে নতুন কমিটি দখল করার পথে হাঁটেনি শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। আপাতত স্কুল ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন প্রধান শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট সার্কুলার স্কুল ইনস্পেক্টরা।

শোনা যাচ্ছে, কেন্দ্রের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে নতুন যে ম্যানেজিং কমিটি হবে, তার অধিকাংশই আসবেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়ে। আর সেখানেও মাতৃশক্তির জন্য এক বড় অংশ সংরক্ষিত থাকতে চলেছে। অর্থাৎ, গণতান্ত্রিকভাবে স্কুল পরিচালনায় নারীদের ভূমিকা এবার অনেকটা বড় হবে।

অন্যদিকে, কলেজের গভর্নিং বডির এক্স-অফিসিও প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন সেই বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক। না, বিজেপি বিধায়ক নয়। সেই বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক। অর্থাৎ, যেচ-৫টি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির বিধায়ক নেই, সেখানের কলেজগুলোর মাথায় বসতে

চলেছেন বিরোধী কোনও বিধায়ক। গণতন্ত্রে এটাই স্বাভাবিক পদ্ধতি।

এতদিন এটা হত না। কিন্তু বিজেপি এসে প্রমাণ করল, রাষ্ট্র, সংবিধান এবং গণতন্ত্রের উপরে কোনওদিনই তাদের কাছে দল নয়।

চতুর্থ পরিবর্তন এসেছে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে। ইউনিভার্সিটি লেভেলে বাম এবং তৃণমূল অধ্যাপকদের মৌরসিপাট্টা চলত এতদিন। এমন অধ্যাপক ছিলেন, যিনি প্রয়োজনীয় ডিগ্রিটুকু রাখেননি। এমন অধ্যাপক আছেন, যাঁরা কয়েক প্রজন্ম ধরে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়ে যাচ্ছেন। আবার একটা বড় সংখ্যায় এমনও অধ্যাপক আছেন, যাঁরা পাটি করে চাকরিতে ঢুকে সারাদিন যেখানে পাটিবাজিই করেন।

শেষ পাঁচ দশকের অপশাসনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হয়ে গেছে পাটি অফিস এবং অধ্যাপকদের একটা বড় অংশ হয়ে গেছে সিপিএম ক্যাডারদের রাজনৈতিক গুরু। বিজেপি ক্ষমতায় এসেই বুঝেছিল, এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য বদলির আইন এনেছে বিজেপি সরকার। আশা করা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে পাটিতন্ত্র কায়েম হয়েছে, তার চক্রব্যূহ থেকে খুব দ্রুত বেরিয়ে আসতে পারব আমরা।

আপাতত সাম্প্রতিকতম পরিবর্তন আসছে মাদ্রাসা শিক্ষায়। বেসরকারিভাবে জানা যাচ্ছে, খারিজি মাদ্রাসার সংখ্যা এ রাজ্যে প্রায় এগারো হাজার। আপাতত বিভিন্ন জেলার জেলাশাসকদের রিপোর্টের ভিত্তিতে বেআইনি হিসেবে চিহ্নিত করা গেছে ২,৩৯৬টি মাদ্রাসাকে। ঠিক পড়েছেন পাঠক, ইতিমধ্যে চিহ্নিত হওয়া বেআইনি মাদ্রাসার সংখ্যা ২,৩৯৬! নিশ্চিতভাবেই সে সংখ্যা পরে আরও বাড়বে।

আরও অবাক করা কথা হল, এই বেআইনি খারিজি মাদ্রাসাগুলির বড় অংশ নিয়মিতভাবে সরকারি অনুমোদন পেয়ে এসেছে। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরে জেলাশাসকদের নেতৃত্বে এক সমীক্ষা চালায় বেআইনি মাদ্রাসা খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে। তাতেই সামনে আসে এই সংখ্যা।

আপাতত, এই সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রথম ধাপে ২৫২টি মাদ্রাসা সম্পূর্ণ বন্ধ বা বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এর পাশাপাশি আরও ১০০টি মাদ্রাসাকে শোকজ পাঠানো হয়েছে। প্রেস হয়ে এই লেখা যতক্ষণে পাঠকের হাতে পৌঁছবে, ততদিনে চিহ্নিত হওয়া বেআইনি মাদ্রাসার সংখ্যা এবং বন্ধ করে দেওয়া মাদ্রাসার সংখ্যা নিশ্চিতভাবেই অনেকটা বাড়বে।

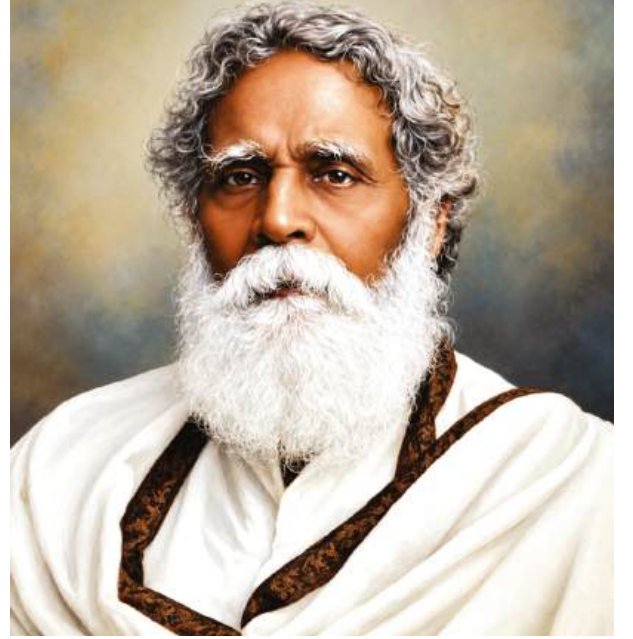
একটা সময় পুরো শিক্ষাদপ্তর ছিল জেলো। পরিস্থিতি এতটাই শোচনীয় হয়ে গিয়েছিল যে, দেশ তো নয়ই, গোটা বিশ্বের কাছে মুখ দেখানোর পরিস্থিতি ছিল না রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের। নিশ্চিতভাবে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে এবং শিক্ষামন্ত্রী শ্রী দীপক বর্মন ও উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসবে।

নিশ্চিতভাবেই ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা আবার প্রথম সারিতে উঠে আসবে। নিশ্চিতভাবেই শিক্ষিত প্রজন্ম তাদের শিক্ষার যোগ্য মর্যাদা পাবে আমাদের রাজ্যে।

হিন্দু জাতীয়তাবাদের জনক ঋষি রাজনারায়ণ বসু-র ২০০তম জন্মবার্ষিকী

অধ্যাপক ড. অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দু মেলা ১৮৬৭-তে শুরু হয়ে ১৮৮০ পর্যন্ত প্রত্যেক বছর আয়োজিত হয়েছিল। হিন্দু মেলার উৎপত্তি সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখছেন, "বাবু নবগোপাল মিত্র প্রথম হিন্দু মেলা আয়োজন করার ভাবেন আমার 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা' সংক্রান্ত লেখাটি পড়ে। এটা তিনি আমার সামনে কোনরকম ইতঃস্তত না করেই স্বীকার করেন।



আধুনিক ভারতবর্ষে আরও অনেক কিছুর মতই হিন্দু জাতীয়তাবাদী চিন্তাও বাঙ্গালীদেরই অবদান। সামাজিক সংগঠন, সাহিত্য, রাজনীতি, আধ্যাত্মিকতা সকলক্ষেত্রে হিন্দু জাতীয়তাবাদী ধারণার ডিসকোর্স তৈরি করেছিলেন রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, অরবিন্দ ঘোষ, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দ-র মত কৃতি বাঙ্গালী সন্তানরা।

উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে একটি অবজ্ঞার মনোভাব ও খৃস্টান ধর্মের প্রতি আগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু এই শতকেরই দ্বিতীয় ভাগে এই অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়। স্যর উইলিয়াম জোন্স ও এইচ. টি. প্রিন্সেপ-এর মত প্রাচ্যবিদদের কাজকর্ম, আলেকজান্ডার কানিংহামের বিভিন্ন খননকার্য এবং ম্যাক্স মূলার, উইলসন, ফারগুসন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং অন্যান্যদের লেখালেখির ফলে প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে শিক্ষিত ভারতীয়রা সচেতন হয়। তাঁরা বুঝতে পারেন যে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য গ্রীস ও রোমের তুলনায় কিছু কম গৌরবোজ্জ্বল ছিল না। ইউরোপীয় পণ্ডিতরা দেখান যে হিন্দু এবং ইউরোপীয়দের পূর্বপুরুষরা একই জাতিভুক্ত ছিলেন, বৈদিক

সাহিত্য হল পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য এবং উপনিষদে আছে মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক চিন্তাভাবনাসমূহ। জেমস প্রিন্সেপ ব্রাহ্মী লিপি পাঠোদ্ধার করার ফলে শিক্ষিত ভারতীয়রা জানতে পারেন যে, মৌর্য সম্রাট অশোকের অধীনে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তান ছিল।

উনবিংশ শতকে বাংলার অন্যতম মনীষী রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯ সাল)-কে 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক' হিসাবে অভিহিত করা হয়। ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখছেন যে, বাংলায় প্রথম খোলাখুলিভাবে জাতীয়তাবাদী মতবাদের কথা বলতে শুরু করেন রাজনারায়ণ বসু। তাঁর অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস ছিল প্রাচীন হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি অধ্যাপক কমল কুমার ঘটক তাঁর গ্রন্থ 'Hindu Revivalism in Bengal: Rammohun to Ramakrishna'-এ বলেছেন, রাজনারায়ণ বসু ছিলেন হিন্দু পুনঃজাগরণের উদগাতা। ১৮৬৬ সালে তিনি ইংরেজি ভাষায় একটি পুস্তিকা রচনা করেন- "Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal" নামে। রাজনারায়ণ বসু-র চিন্তাভাবনারই বাস্তবায়ন ঘটান নবগোপাল মিত্র 'হিন্দু মেলা' আয়োজনের মাধ্যমে। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন,



বারহইপুর জনসভার মঞ্চ, ২০২৪।

হিন্দু মেলা বাংলায় জাতীয়তাবোধের বিকাশের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

নবগোপাল মিত্র 'ন্যাশনাল সোসাইটি'-র উদ্যোগে ১৮৭২ সালে ১৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে (বর্তমান বিধান সরণী) 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' শীর্ষক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেন। এই সভার বক্তা ছিলেন রাজনারায়ণ বসু ও সভাপতি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রাজনারায়ণ বসুর এই বক্তৃতাটি উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। সেই সময়ের সংস্কৃত কলেজের স্মৃতির বিখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক ভরতচন্দ্র শিরোমণি 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় বলেন যে- "হিন্দু ধর্ম ডুবিতেছিল, রাজনারায়ণবাবু তাহা রক্ষা করিলেন।" রাজনারায়ণ বসু ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত সে যুগের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বের ও ব্রাহ্ম নেতার হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রসারেই সহায়তা করে। কমল কুমার ঘটক তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, রাজনারায়ণ বসু ছিলেন হিন্দু পুনরুত্থানবাদের উদগাতা। তাঁর অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস ছিল প্রাচীন হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি। বিপিন চন্দ্র পাল লেখেন তাঁর "হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব-র ওপর তাঁর বাংলায় বক্তব্যটি ছিল ইউরোপের আক্রমণাত্মক চিন্তাভাবনা ও সভ্যতার প্রতি ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রথম চ্যালেঞ্জ।"



ঋষি রাজনারায়ণের বোড়াল বাসভবনের পুনর্নির্মাণ সমারোহে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

ছবি ঋনঃ ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজ

রাজনারায়ণ বসু হিন্দু ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদী চিন্তাকে সবল করার জন্য একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। 'The Old Hindu's Hope' বা 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' শীর্ষক পুস্তিকায় রাজনারায়ণ এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। রাজনারায়ণ ইসলাম ও খৃস্টান ধর্মাবলম্বী ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত ধর্মাবলম্বীকে হিন্দু হিসাবে চিহ্নিত করেন। শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম প্রমুখদের হিন্দুধর্মের অঙ্গ হিসাবে স্বীকার করে তিনি ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে 'মহাহিন্দু সমিতি' নামে একটি সংগঠন স্থাপনের প্রস্তাব দেন।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে যে জাতীয়তাবাদী তথা হিন্দু জাতীয়তাবাদী চিন্তার সূত্রপাত হয় অখণ্ড বঙ্গে- তারই অন্যতম উদগাতা ছিলেন নবগোপাল মিত্র। নবগোপাল মিত্র 'ন্যাশনাল সোসাইটি' তৈরি করেন হিন্দু মেলার চার বছর হয়ে যাওয়ার পর। এর উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য ও জাতীয়তাবাদী চেতনার জাগরণ ঘটান। প্রত্যেক মাসে একবার তাঁরা মিলিত হতেন এবং ঐক্য ও জাতীয়তাবাদী চেতনার ওপর বক্তৃতা হত। এইভাবেই একবার রাজনারায়ণ বসু হিন্দু ধর্মের মহানতা ও শ্রেষ্ঠত্ব-র ওপর বক্তব্য রাখেন। এই বক্তৃতার একটি সংক্ষিপ্ত রূপ একটি পুস্তিকা রূপে বেরোয় এবং ১২৭৯-এর বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে 'বঙ্গদর্শন'-এ বন্ধিত এর একটি পর্যালোচনা বার করেন। রাজনারায়ণ বসু বলেন, "আমি আশা করি যে হিন্দু জাতি পুনরায় তার জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা এবং সভ্যতা ফিরে পাক যার জন্য সে প্রাচীন কালে পরিচিত ছিল।"

হিন্দু মেলা ১৮৬৭-তে শুরু হয়ে ১৮৮০ পর্যন্ত প্রত্যেক বছর আয়োজিত হয়েছিল। হিন্দু মেলার উৎপত্তি সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখছেন, "বাবু নবগোপাল মিত্র প্রথম হিন্দু মেলা আয়োজন করার ভাবেন আমার 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা' সংক্রান্ত লেখাটি পড়ে। এটা তিনি আমার সামনে কোনরকম ইতঃস্তত না করেই স্বীকার করেন। 'হিন্দু মেলা' শুরু করার পর নবগোপাল বাবু ন্যাশনাল সোসাইটি গঠন করেন এটি পরিচালনা করার জন্য। এই সোসাইটিটি আমার পরিকল্পিত 'সভা'র অনুকরণেই গঠিত হয়।"

১৮৭৬ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'স্বদেশানুরাগ' বলে একটি প্রবন্ধ ছাপান হয়। এতে বলা হয় যে- ইংরেজি শিক্ষা যখন প্রথম এদেশে আসে তখন ইংরেজি শিক্ষিত মানুষজন নিজের ধর্ম, প্রথা, আচার-আচরণের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে থাকে। কিন্তু বর্তমান (১৮৭৬ সাল) ইংরেজি শিক্ষিত সংস্কৃতিবান মানুষদের মধ্যে এই ভাবনার বদল ঘটেছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব ও হিন্দু ধর্ম ও তার প্রথা ও আচার-আচরণ সম্পর্কে প্রশংসনীয় কথাবার্তা কোন সভায় বলা হলে মানুষ এখন তা

অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে শোনো মানুষ এখন বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন যে, হিন্দু ধর্মশাস্ত্রগুলিতে পরম সত্যকে যেভাবে দেখানো হয়েছে, অন্য ধর্মীয় শাস্ত্রগুলিতে তা বিরল এবং তাঁরা এও বিশ্বাস করেন যে, হিন্দু ধর্মে এমন অনেক প্রথা রয়েছে যা প্রশংসাযোগ্য এবং তা অন্যান্য ধর্মগুলিতে পাওয়া যায় না। মানুষের মনে ধীরে ধীরে এখন দেশাত্মবোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নিজের ধর্মের প্রতি অবজ্ঞার মনোভাব হ্রাস পাচ্ছে। - 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার এই প্রবন্ধের লেখক উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগের থেকে দ্বিতীয় ভাগে ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিন্তাভাবনার এই পার্থক্যের জন্য কতকগুলি কারণ চিহ্নিত করেছেন। এরমধ্যে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক একটি জাতীয়তাবাদী সমিতি গঠনের প্রস্তাব সম্বলিত একটি পুস্তিকা লেখা এবং সেই অনুযায়ী নবগোপাল মিত্র কর্তৃক 'হিন্দু মেলা'-র আয়োজন ও 'ন্যাশনাল সোসাইটি' গঠনকে।

হিন্দু মেলার উদ্যোক্তারা হিন্দু জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ববোধের অভিমান জাগরিত করার জন্য চৈত্র সংক্রান্তির সময় হিন্দু মেলার বার্ষিক অধিবেশনের আয়োজন করতেন। এই মেলায় কুটির শিল্প-জাত দ্রব্য ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হত। এর সঙ্গে থাকত শিল্প প্রদর্শনী ও দেশীয় খেলাধুলার প্রতিযোগিতা। মেলায় সাহিত্য ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হত। সব বিভাগেই পুরস্কারের বন্দোবস্ত ছিল। হিন্দু মেলাতে নবগোপাল মিত্র জিমন্যাস্টিক, কুস্তি ও অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় খেলার ওপর জোর দেন। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেন যে, "হিন্দু মেলাকে (চৈত্র মেলা) আমরা জাতীয় আন্দোলনের প্রথম সম্পন্দন বলতে পারি।"

হিন্দু মেলা সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। দেশীয় কুটির শিল্পের ওপর গুরুত্ব দিয়ে হিন্দু মেলা প্রকৃতপক্ষে চেয়েছিল দেশীয় শিল্পের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে ভারতবর্ষকে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর একটি দেশরূপে গড়ে তুলতে। এর বহু দশক পরে বিংশ শতকের প্রথম ভাগে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন শুরু হওয়ার অনেক আগেই হিন্দু মেলার আয়োজনকারীরা এই ধরনের ভাবনা ভেবেছিলেন।

হিন্দু মেলার আর্থিক দায়ভার অনেকটাই বহন করত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মেলায়

সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার বাল্য কথা' ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জীবন স্মৃতি'-তে হিন্দু মেলার উচ্ছসিত বর্ণনা পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বালক বয়সে নিয়মিত কবিতাও পড়তেন এই মেলায়।

১৮৭৭ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ বড়লাট লর্ড লিটন দিল্লী দরবারের আহ্বান করেন। সেখানে দেশীয় নৃপতিদের ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রাজভক্তির উচ্ছ্বাস দেখে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা রচনা করেন। সেটি ১৮৭৭-এ হিন্দু মেলার অধিবেশনে পাঠ করেন। এর অংশবিশেষ হল-

"ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা

যে গায় গাক আমরা গাব না

আমরা গাব না হরষ গান,

এসো গো আমরা যে কজন আছি

আমরা ধরিব আর এক তানা।"

বহু ঐতিহাসিকই মনে করেন যে, হিন্দু মেলা ছিল আমাদের জাতীয় চেতনার প্রথম প্রকাশ। মেলার কাযবিবরণী থেকে এটি পরিষ্কার বোঝা যায় যে এর উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি। অধ্যাপক কমল কুমার ঘটক তাঁর গ্রন্থ 'Hindu Revivalism

in Bengal: Rammohun to Ramakrishna'-এ বলেছেন,

"মেলার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ধর্মের পুরনো গৌরবের পুনঃজাগরণ ঘটানো। এর নেতারা স্বদেশপ্রেম, স্বাধীনতা ও হিন্দুধর্মের কথা এক নিঃশ্বাসে বলতেন এবং এর মধ্যে কোন পারস্পরিক বিরোধ দেখতে পেতেন না।" এই মেলার অন্যতম সদস্য মনমোহন বসু ১৮৬৮-তে বলেন, "এই মেলার মাধ্যমেই হিন্দু ধর্মের পুনঃজাগরণ ও হিন্দুদের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে।" বিখ্যাত ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র

মজুমদারও তাঁর 'History of Modern

Bengal, Part-One' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা- ৩৮০-৩৮১) মন্তব্য

করেছেন, "ভারতবর্ষে জাতীয়তার প্রধান অবলম্বনই হল হিন্দু ধর্ম, কথাটি শুনতে অপ্রীতিকর লাগলেও- এটি অস্বীকার করা কোনমতেই সম্ভব নয়।"

এইভাবেই রাজনারায়ণ বসু-র লেখালেখি, বক্তৃতা ও অনুপ্রেরণায় ভারতবর্ষে হিন্দু জাতীয়তাবাদের পথ চলা শুরু হয়- যা আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

ছবিতে খবর



নিউটাউন কনভেনশন সেন্টারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সেবা-সমর্পণের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে “সেবা সংকল্প অভিযান”-এর প্রস্তুতি বৈঠকে রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য সহ মাননীয় রাজ্য নেতৃত্ব।



‘সেবা সংকল্প অভিযান’-এর প্রস্তুতি ও রূপরেখা পর্যালোচনা করতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারীর সভাপতিত্বে নবান্ন সভাঘরের বৈঠকে রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী-বিধায়ক ও বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সহ বরিষ্ঠ সরকারি আধিকারিকরা।



পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহাঅভিযান উপলক্ষে হাওড়া সদর সাংগঠনিক জেলার কর্মশালায় রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য সহ জেলা নেতৃত্ব।



কলকাতায় বিশিষ্ট অভিনেতা-সাংসদ দেব-এর বাসভবনে শ্রী গণপতি আরাধনায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সুকান্ত মজুমদার।



নন্দীগ্রাম বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব।



রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠকে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী মহাশয় সহ রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব।



বিজেপি সটলেক কার্যালয়ে রাজ্য কোর কমিটির বিশেষ বৈঠক।



সল্টলেক বিজেপি কার্যালয়ে বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব।



মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে কলকাতার বীন্দ্রসদনে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রী সুনীল বানসাল এবং সাংসদ শ্রী জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো।

ছবিতে খবর



কলকাতার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হোমিওপ্যাথির গৌরবময় সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন রাজ্য বিজেপির বিশিষ্ট নেতৃত্ববর্গ।



বালুরঘাটে প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার মহাশয়, বিধায়কগণ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকগণ।



নন্দীগ্রামের রোয়াপাড়ায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের একাধিক জনকল্যাণমূলক ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শুভ সূচনা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় সহ সম্মানীয় সাংসদ, বিধায়কবৃন্দ, দলীয় নেতৃত্ব ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।



নৈহাটি মণ্ডল-১-এর উদ্যোগে সেবা সংকল্প অভিযান
২০২৬-এর প্রস্তুতি বৈঠকে জেলা নেতৃত্ব।



যাদবপুর জেলার 'সেবা সংকল্প অভিযান' কর্মশালায় রাজপুর রবীন্দ্রভবনে
রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতি শশী অগ্নিহোত্রী সহ জেলা নেতৃত্ব।



তমলুক সাংগঠনিক জেলায় সেবা সংকল্প অভিযান
২০২৬-এর কর্মশালায় জেলা নেতৃত্ব।



বাঁকুড়া মণ্ডল-৩-এ সেবা সংকল্প অভিযান ২০২৬-এর
প্রশিক্ষণ শিবিরে রাজ্য-জেলা ও বুথ স্তরের নেতৃত্ব।



বিধাননগর মণ্ডল ১-এর সেবা সংকল্প অভিযান
২০২৬-এর সাংগঠনিক বৈঠকে জেলা নেতৃত্ব।



আমডাঙ্গা মণ্ডল ২-এর সেবা সংকল্প অভিযান
২০২৬-এর কর্মশালায় জেলা নেতৃত্ব।

ছবিতে খবর



নৈহাটি মন্ডল ২-এর সেবা সংকল্প অভিযান ২০২৬-এর সংগঠনিক কর্মসূচীতে জেলা নেতৃত্ব।



মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলার সেবা সংকল্প অভিযান ২০২৬-এর কর্মশালায় জেলা নেতৃত্ব।



কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে সেবা সংকল্প অভিযান ২০২৬-এর কর্মসূচীতে জেলা নেতৃত্ব।



সিউড়ির রবীন্দ্রসদনে সেবা সংকল্প অভিযান ২০২৬-এর কর্মসূচীতে বিশেষ অতিথি রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী মহাশয় ও জেলা নেতৃত্ব।



দক্ষিণ ২৪ পরগনা প্রশাসনিক জেলায় সেবা সংকল্প অভিযান সম্পর্কিত কর্মসূচী নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠক।



হুগলি সার্কিট হাউসে 'সেবা সংকল্প অভিযান' এর প্রস্তুতি সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা।



নন্দীগ্রাম বিধানসভার উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হাঁসিরানী রথ মহাশয়ার মনোনয়ন উপলক্ষে পদযাত্রায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়।



রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে রেজিনগর বিধানসভার উপনির্বাচনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী শ্রী শাঁখারভ সরকার মহাশয়ের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার মুহূর্ত।



শান্তিপুর বিধানসভার মন্ডল ৪- এ সেবা সংকল্প অভিযানের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় জেলা নেতৃত্ব।



মালদা জেলা বিজেপি টিচার্স সেলের শিক্ষক দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব।





দীনদয়াল উপাধ্যায়

সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ, একাত্ম মানববাদ ও
ভারত নির্মাণের এক স্বপ্নদ্রষ্টা

সৌভিক দত্ত

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের বক্তব্যের মূল সুর ছিল ভারত আধুনিক হবে, কিন্তু নিজের পরিচয় হারিয়ে নয়। অর্থাৎ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, আধুনিক শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু তার সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতি, পরিবারব্যবস্থা, সামাজিক মূল্যবোধ এবং সভ্যতাগত আত্মপরিচয়ও বজায় রাখতে হবে।

ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয় তখন ভারতের সামনে দুটো রাস্তা দেখেছিল তৎকালীন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃত্বরা। একটা ছিল পশ্চিমী ভোগবাদী পথে হেটে আমেরিকার অঙ্ক অনুকরণ করে নিজেদের সামাজিক শিকড় উপড়ে ফেলা আর দ্বিতীয়টা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুকরণ করে জনগণকে বাধ্যতামূলক দারিদ্র্য ও কষ্ট ভোগ করিয়ে দেশের মানুষকে বেঁচে থাকতেই নরক দর্শন করিয়ে দেওয়া। নেহেরুর নেতৃত্বে দ্বিতীয় পথটাই বেছে নিয়েছিল তৎকালীন ভারত। কিন্তু এই দুটির বাইরেও যে তৃতীয় কোনো বিকল্প থাকতে পারে অর্থাৎ ভারতবর্ষকে ভারতবর্ষের আদর্শেই এগিয়ে নেওয়া যেতে পারে সেইটা তৎকালীন ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর কারোরই তেমন মাথায় আসেনি। অন্যদিকে রাজনৈতিক লড়াই থেকে বহু দূরে বসে যে সংগঠনটি ভারতবর্ষের পুনঃ ভারতীয়করণ এর জন্যে কাজ করে যাচ্ছিল তাদের মধ্যে থেকেই এমন কেউ কেউ উঠে এসেছিলেন যারা পরবর্তীতে রাজনৈতিক ময়দানে এসে নিজেদের মাতৃ সংগঠনের শেখানো শিক্ষা প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন। তাদেরই অন্যতম হলেন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়।

তাঁর রাজনৈতিক জীবন ছিল তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা ছিল সুদূরপ্রসারী। ভারতীয় জনসংঘ এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টির মতাদর্শগত বিকাশে তাঁর চিন্তা গভীর প্রভাব ফেলেছে এবং বর্তমানে দীর্ঘ সময় ধরে ভারতীয় জনতা পার্টি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকায় এটা বলাই যায় যে বর্তমান ভারতবর্ষের যে পথে এগোচ্ছে সেই পথে অন্যতম দিশারী হলেন দীনদয়াল উপাধ্যায়। দীনদয়াল উপাধ্যায়ের বিশেষত্ব ছিল তিনি পশ্চিমের বা সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক মতাদর্শকে সরাসরি অনুসরণ করার পরিবর্তে ভারতীয় সভ্যতা ও দর্শনের ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণের চেষ্টা

করেছিলেন। তাঁর এই দর্শনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ ঘটে 'একাত্ম মানববাদ' বা Integral Humanism-এর মধ্যে।

স্বাধীনতার পর ভারত ও বিকল্প রাজনৈতিক চিন্তার প্রয়োজন

১৯৫১ সালে শ্রমিকদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজেএস এর প্রতিষ্ঠা হলে দীনদয়াল উপাধ্যায় কে সঙ্ঘ থেকে সেখানে পাঠানো হয় দায়িত্ব নিতে। তিনি উত্তর প্রদেশ শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং পরে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে তিনি জনসঙ্ঘের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসেন।

১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে জনসঙ্ঘ লোকসভায় তৃতীয় বৃহত্তম দল হয়ে ওঠে। সবাই বুঝতে পারে যে দেশের মানুষ তৃতীয় কোনো বিকল্পের জন্য প্রস্তুত কিন্তু সেখানে অভাব সঠিক নেতৃত্বের। এমতাবস্থায় ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরে দলের কালিকট অধিবেশনে জনসঙ্ঘের সভাপতি হন দীনদয়াল উপাধ্যায়। যদিও ঠিক পরের বছরই অকাল মৃত্যু তাঁর যাত্রাপথ থামিয়ে দেয় কিন্তু সেই সভায় সভাপতির ভাষনই তিনি কংগ্রেস বিরোধী জোট নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে যেভাবে বিকল্পের আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেই পথেই পরবর্তীকালে কংগ্রেস সরকারের পতন হয় আর সারা পৃথিবী বুঝতে পারে যে সোভিয়েতপন্থী কংগ্রেসের বাইরেও ভারতবর্ষে অন্য কোনো আদর্শ জয়লাভ করতে পারে।

হিন্দুত্ব: ধর্মীয় পরিচয়ের বাইরে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের রাজনৈতিক চিন্তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল হিন্দুত্বের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁর কাছে 'হিন্দু' শব্দটি কেবল একটি ধর্মীয় পরিচয় ছিল না; বরং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিচয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ভারতীয় জাতীয়তার ভিত্তি কেবল একটি আধুনিক রাজনৈতিক চুক্তি নয়। ভারতের দীর্ঘ সভ্যতাগত ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, তীর্থ, সাহিত্য, দর্শন ও সামাজিক স্মৃতির মধ্যে একটি জাতীয় চেতনার

ধারাবাহিকতা রয়েছে। এই কারণেই হিন্দুত্ববাদী চিন্তাধারায় ভারত কেবল ১৯৪৭ সালে জন্ম নেওয়া একটি রাষ্ট্র নয়। ভারত একটি প্রাচীন সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক জাতি, যার রাজনৈতিক ইউরোপীয় জাতি রাষ্ট্রের অনুকরণে রাষ্ট্ররূপ আধুনিক হলেও তার সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব বহু সহস্রাব্দের। দীনদয়াল উপাধ্যায় এই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদকে রাজনৈতিক চিন্তার কেন্দ্রে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

একাত্ম মানববাদ: দীনদয়ালের সবচেয়ে বড় অবদান

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অবদান হলো তাঁর 'একাত্ম মানববাদ'। ১৯৬৫ সালে তিনি ধারাবাহিক বক্তৃতার মাধ্যমে এই দর্শন মানুষের সামনে তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, মানুষের উন্নয়নকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উৎপাদন বা রাজনৈতিক ক্ষমতার মাধ্যমে বিচার করা যায় না। মানুষের শরীর, মন, বুদ্ধি এবং আত্মা - এই সমস্ত দিকের সমন্বিত বিকাশ প্রয়োজনা। তাই শুধু মানুষের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করলেই মানুষের পূর্ণ বিকাশ হয় না। এই দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতির চার পুরুষার্থ- ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এটি মানুষের শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার ওপর জোর দেয়।

উপাধ্যায়ের চিন্তায় ব্যক্তি সমাজের বাইরে সম্পূর্ণ স্বাধীন কোনো বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়। তিনি বলতেন, মানুষের বস্তুগত প্রয়োজন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই তার নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদাও গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারণা থেকেই তিনি ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ, সমাজের সঙ্গে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে বৃহত্তর মানবসমাজের একটি সমন্বিত সম্পর্কের কথা বলেন।

'ধর্ম' ও 'ধর্মরাষ্ট্র'-এর ধারণা

দীনদয়ালের রাজনৈতিক চিন্তায় 'ধর্ম' একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। এখানে ধর্ম বলতে শুধুমাত্র কোনো নির্দিষ্ট উপাসনা পদ্ধতি অর্থাৎ religion বোঝানো হয় না। তাঁর ব্যাখ্যায় ধর্ম হচ্ছে ভারতের চিরন্তন রীতিনীতি ও নৈতিকতা, যা সমাজ ও রাষ্ট্রকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম মানেই তাই। ধৃ ধাতু থেকে উৎপন্ন এই শব্দের অর্থ হল যা ধারণ করে। ধর্ম এবং religion সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। ভারতের চিন্তন জগতে religion নামক এমন কিছু ধারণা ছিল না যা আধ্যাত্মিকতার নামে প্রাতিষ্ঠানিকতার জন্ম দেয়। ফলে রিলিজিয়ন এর বিপরীতে কোনো ভারতীয় শব্দ না পেয়ে এর অনুবাদ করা হয়েছে ধর্ম। দীনদয়াল উপাধ্যায়ের চিন্তায় ভারতকে ধর্মরাষ্ট্র হতে হবে এবং সেই রাষ্ট্র হবে ভারতীয় নীতি নৈতিকতা দ্বারা পরিপূর্ণ।

অর্থনৈতিক চিন্তা: স্বদেশি ও বিকেন্দ্রীকরণ

দীনদয়াল উপাধ্যায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও একটি ভারতীয় মডেলের কথা বলেছিলেন।

তিনি অন্ধ পুঁজিবাদ কিংবা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সমাজতন্ত্র - দুটিরই সীমাবদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁর অর্থনৈতিক দর্শনে ছোট শিল্প, কৃষি, স্থানীয় উৎপাদন, বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্বনির্ভরতার গুরুত্ব ছিল। মানুষের বাস্তব প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ধারণা তিনি দিয়েছিলেন। তাঁর অর্থনীতির উদ্দেশ্য কেবল সংখ্যাগত বৃদ্ধি নয়, মানুষের জীবনমানের উন্নতি এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করাও। অর্থনীতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এমন ধারণা তাঁর চিন্তায় স্পষ্ট। তাঁর অর্থনৈতিক ধারণায় মানুষ অর্থনীতির জন্য নয়, অর্থনীতি মানুষের জন্য।

আজকের দিনে যে 'আত্মনির্ভর ভারত', স্থানীয় উৎপাদন, ক্ষুদ্র শিল্প, গ্রামীণ অর্থনীতি এবং দেশীয় পণ্যের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে, এসব কিছুরই রাজনৈতিক সূচনা হলো দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানবতাবাদ। তার তথ্যেরই বাস্তব প্রয়োগ করছেন বর্তমান ভারতের দিকনির্দেশকরা।

অন্ত্যোদয়: সমাজের শেষতম মানুষের কাছে পৌঁছানো

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা ছিল 'অন্ত্যোদয়'। শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো “অন্তিম মানুষের উদয়” অর্থাৎ সমাজের সর্বশেষ সারিতে থাকা মানুষদের উন্নয়ন। রাষ্ট্রের উন্নয়নের আসল সুফল তখনই পাওয়া যায় যখন সমাজের একেবারে প্রান্তিক অবস্থানে থাকা সবথেকে দুর্বল ও দরিদ্র মানুষরাও সেই উন্নয়নে সামিল হয়। এই ধারণাটি পরবর্তীকালে ভারতীয় জনসংঘ এবং বিজেপির রাজনৈতিক ভাষ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

বর্তমান ভারতে আমরা এই তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখছি জন ধন অ্যাকাউন্টে,

যে মানুষটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাইরে, তাকে তার মধ্যে নিয়ে আসা। DBT অর্থাৎ Direct Benefit Transfer ব্যবস্থায় যেখানে মধ্যস্বত্বভোগী সরিয়ে সরাসরি সাধারণ মানুষের একাউন্টে টাকা পাঠানো হচ্ছে। আর মাঝে মধ্যস্বত্বভোগী থাকলে যে কী পরিণতি হয় সেটা মাত্র কয়েক মাস আগে পর্যন্ত কাটমানি শাসন সহ্য করে আশা বাঙালিদের পক্ষে বুঝতে পারে মোটেও কঠিন কিছু না। অন্ত্যোদয় প্রকাশ পাচ্ছে উজ্জ্বলা যোজনাতে, যেখানে গরিব পরিবারের গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হচ্ছে ফলে তারা কার্ড বা কয়লা ধরনের অস্বাস্থ্যকর জ্বালানি থেকে মুক্তি পাচ্ছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত উজ্জ্বলার অধীনে ১০.৫৭ কোটিরও বেশি পরিবারে গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। পিএম আবাস যোজনাকেও এর একটি

সুন্দর ব্যবহার হিসেবে দেখানো যায়। এর মাধ্যমে গ্রামীণ ও শহুরে দরিদ্র পরিবারের জন্য পাকা বাড়ি তৈরির সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও জল জীবন মিশন, কোভিড চলাকালীন বিনামূল্যে খাদ্যশস্য, আয়ুষ্সান ভারত, অন্তর্গত যোজনা ইত্যাদি বিভিন্নভাবে বর্তমান নীতিনির্ধারণকারী অর্থাৎ দীনদয়াল উপাধ্যায়ের উত্তরসূরীরা উপাধ্যায়ের অন্ত্যোদয় ধারণাকে বাস্তবে রূপ দিয়ে চলেছেন।

রাজনৈতিক জীবনে ভূমিকা

১৯৫১ সালের ২১ অক্টোবর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভারতীয় জনসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। দীনদয়াল উপাধ্যায় সংগঠনটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা ছিল অসাধারণ। তিনি শুধু বক্তৃতা দেওয়া বা রাজনৈতিক বক্তব্য রাখার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন না, বরং তৃণমূল স্তরে সংগঠন নির্মাণে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। দলীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণ, সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি এবং আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক কর্মী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫৩ সালে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর জনসংঘের সংগঠনকে টিকিয়ে রাখা এবং বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে দীনদয়ালের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৯৬৭ সালে তিনি ভারতীয় জনসংঘের সর্বভারতীয় সভাপতিও হন।

কাশ্মীর ও জাতীয় ঐক্য

স্বাধীনোত্তর ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্ন ছিল জম্মু ও কাশ্মীরের সাংবিধানিক অবস্থান। নেহেরু দরকার আলাদা পতাকা, আলাদা সংবিধান, কাশ্মীরের নিজস্ব প্রধানমন্ত্রী ইত্যাদি শুভে শেখ আব্দুল্লাহর কাছে নতি স্বীকার করে কাশ্মীরের প্রায় স্বাধীন অবস্থান মেনে নিলেও জনসংঘ এই প্রশ্নে শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী অবস্থান গ্রহণ করে।

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের রাজনৈতিক চিন্তায় জাতীয় ঐক্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর দৃষ্টিতে ভারতের রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে এমন কোনো ব্যবস্থা থাকা উচিত নয়, যা ভারতীয় জাতীয়তার অভিন্নতার প্রশ্নকে দুর্বল করে। আজও ভারতীয় জনতা পাটি সেই আদর্শকেই লালন করে চলেছে। কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা হটিয়ে দিয়ে কাশ্মীরকে ভারতের মূল স্রোতে নিয়ে আসা হয়েছে, দীনদয়াল উপাধ্যায়ের উত্তরসূরী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরেই।

সাংস্কৃতিক আত্মবিশ্বাসের আহ্বান

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের চিন্তার একটি বিশেষ শক্তি ছিল ভারতীয়দের মধ্যে সাংস্কৃতিক আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করার চেষ্টা।

প্রথমে মুসলিম এবং পরে খ্রিস্টান উপনিবেশিক শাসন ভারতের যে বড় ক্ষতিটা করে দিয়েছিল সেটা হল ভারতীয়দের আত্মসম্মান ও আত্মগরিমা নষ্ট করে দেওয়া। উপনিবেশিক শাসন ভারতীয় সমাজে এমন একটি মানসিকতা তৈরি হয়েছিল যে উন্নত হওয়ার অর্থ পশ্চিমকে অনুসরণ করা। দীনদয়াল উপাধ্যায় এই ধারণার বিরোধিতা করেন। তাঁর বক্তব্যের মূল সুর ছিল ভারত আধুনিক হবে, কিন্তু নিজের পরিচয় হারিয়ে নয়। অর্থাৎ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, আধুনিক শিক্ষা ও

অর্থনৈতিক উন্নয়ন গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু তার সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতি, পরিবারব্যবস্থা, সামাজিক মূল্যবোধ এবং সভ্যতাগত আত্মপরিচয়ও বজায় রাখতে হবে।

বর্তমানে রাষ্ট্রবাদী সরকার ক্ষমতায় আসায় জাতীয় জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে উপনিবেশিক চিহ্ন মুছে ফেলার যে যাত্রা শুরু হয়েছে, দীনদয়াল উপাধ্যায়ের চিন্তাকে তার পূর্বসূরী হিসেবে দেখা যেতে পারে।

মৃত্যু ও রহস্য

১৯৬৮ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারিতে মুঘলসরাই রেলওয়ে স্টেশনের কাছে দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তাঁর মৃত্যু ভারতীয় রাজনীতিতে গভীর শোকের সৃষ্টি করে। মৃত্যুর পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নানা প্রশ্ন ও বিতর্ক রয়েছে। তাঁর মৃত্যুর ঘটনাটি ভারতীয় জনসংঘের জন্য একটি বড় ধাক্কা ছিল। মাত্র ৫২ বছর বয়সে তাঁর জীবন শেষ হয়ে যায়।

কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা সেখানেই শেষ হয়ে যায়নি। শরীরের মৃত্যুতে মানুষের মৃত্যু হয় সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে। কিন্তু মনীষীদের ক্ষেত্রে তারা বেঁচে থাকেন নিজেদের কাজ ও আদর্শের মধ্যে দিয়ে।

আজ বিজেপির রাজনৈতিক দর্শনে 'একাত্ম মানববাদ', 'অন্ত্যোদয়', 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ', 'স্বদেশি' এবং 'জাতীয় ঐক্য' - এই ধারণাগুলির সঙ্গে দীনদয়াল উপাধ্যায়ের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

তাঁর জন্মদিন ২৫ সেপ্টেম্বর 'অন্ত্যোদয় দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্তও তাঁর সামাজিক দর্শনের গুরুত্বকে তুলে ধরে।

কেন আজও দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রাসঙ্গিক?

একবিংশ শতাব্দীর ভারত আজ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অর্থনীতি। প্রযুক্তি, মহাকাশ গবেষণা, ডিজিটাল অর্থনীতি, অবকাঠামো এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে ভারতের ভূমিকা ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে এই উন্নয়ন যেন সমাজের একটি নির্দিষ্ট স্তরেই আটকে না থাকে। নদীকে যেমন কৃত্রিমভাবে অতিরিক্ত আটকে রাখলে তা একসময় বাঁধ ভেঙে প্লাবন সৃষ্টি করে, একইভাবে সমাজের উন্নয়নকে কৃত্রিমভাবে একটি স্থানে আবদ্ধ করে রাখলে তা একসময় পিছিয়ে পড়া বঞ্চিত মানুষের মধ্যে হিংসা ও রাষ্ট্রবিপ্লবের জন্ম দেয়। তাই সমস্ত মানুষের যাতে সঠিক ও সার্বিক উন্নয়ন হয় সেইটা অবশ্যই আমাদের রাজনৈতিক আদর্শ হওয়া উচিত। আর সেই পথই দেখিয়ে গেছেন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়।

হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে দীনদয়াল উপাধ্যায় তাই একজন গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক নেতৃত্ব। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যেখানে ভারতীয় জনসংঘের রাজনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, সেখানে দীনদয়াল উপাধ্যায় সেই সংগঠনকে একটি সুসংহত আদর্শিক কাঠামো দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। স্বাধীনোত্তর ভারতের স্বাধীন ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তার বেড়ে ওঠার ইতিহাসে দীনদয়াল উপাধ্যায়ের স্থান চিরস্মরণীয় ও চির প্রাসঙ্গিক।

ইতিহাসের শহর চন্দননগর
এবার পর্যটন মানচিত্রে,



ফ্রান্সের সঙ্গে স্বাক্ষরিত হল মড!

- ফ্রান্সের সঙ্গে পর্যটন সংক্রান্ত মড স্বাক্ষর করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সংস্কার করা হবে ঐতিহাসিক 'দ্য রেজিস্ট্রি বিল্ডিং'।
- চন্দননগর, চুচুড়া, ব্যাভেল, শ্রীরামপুর ও ব্যারাকপুরকে যুক্ত করে গড়ে উঠবে বড় হেরিটেজ ট্যুরিজম সার্কিট।
- হুগলি নদীকে কেন্দ্র করে জলপথ পর্যটনেও দেওয়া হবে বিশেষ গুরুত্ব।



পুরনো ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্ম ও পর্যটকদের সামনে
তুলে ধরাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান লক্ষ্য

    / BJP4Bengal |  bjpBengal.org

এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল, ২০২৬

বিদেশি টাকার দালালদের বিরুদ্ধে ভারতের চূড়ান্ত যুদ্ধ

দীপল বিশ্বাস

হঠাৎ করে দেশের আনাচেকানাচে 'গণতান্ত্রিক অধিকার', 'পরিবেশ', 'ধর্ম', 'কৃষক', 'জাতিগত সংরক্ষণ', 'সংখ্যালঘু'-র নামে আগুন জ্বলছে রবা এগুলো কি এমনি এমনি হয়? হয় না। কারণ 'No donations comes free' বিদেশ থেকে আসা প্রতিটি ডলারের গায়ে শর্ত লেখা থাকে। সেই শর্ত হলো ভারতের উত্থানের গতিকে থামিয়ে দাও।

ভারত এখন আর সেই দুর্বল নরম-মানসিকতার ভারত নেই। বর্তমান ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি। অতিমারী, যুদ্ধ পরিস্থিতি, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের মহাসংকটের মধ্যেও উন্নত বিশ্বের বিস্ময়ের উদ্বেক করে ২০২৫ সালে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি হার ৭.৭শতাংশ। অর্থাৎ শুধু মুখের কথা নয় ২০৪৭-এ 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যপূরণে অবিচলভাবে এগিয়ে চলেছে নতুন ভারত। আর ভারতের এই উত্থান দেখে বিশ্বের কিছু তথাকথিত বন্ধু দেশ, কিছু বৃহৎ আন্তর্জাতিক শক্তি আর তাদের দেশীয় দালালদের ঘুম উড়ে গেছে। তাই তারা নতুন খেলা শুরু করেছে, যুদ্ধ নয়, বন্দুক নয়, এবারের অস্ত্র হলো এনজিও, মিডিয়া, বিচারবিভাগের একাংশ আর রাস্তার মব বা উন্নত জনতা। এই ষড়যন্ত্র ভাঙার জন্যই কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে সংসদে আনা হয়েছে এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল, ২০২৬। কড়া আইন আনার ক্ষেত্রে ভারত সরকারের উদ্দেশ্য হলো- দেশে অরাজকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদেশি অর্থের প্রবাহে বাঁধ দেওয়া। 'সার্বভৌম দেশ' অর্থ হলো- দেশটির সরকারি নীতি সবরকম অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রভাবমুক্ত। বিদেশি অর্থে ভারত জুড়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি হলে তাতে বিঘ্নিত হবে ভারতের সার্বভৌমত্ব। এ কারণে এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল, ২০২৬ প্রকৃতপক্ষে এমন একটি আইন যা ভারতের সার্বভৌমত্বের ঘোষণাপত্র।

ফ্রি-তে কিছু পাওয়া যায় না- ডলারের

পেছনের খঞ্জর: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজের মুখে স্বীকার করেছেন যে, 'গ্লোবাল ডিপস্টেটের অস্তিত্ব' রয়েছে। তারা বিভিন্ন দেশে সরকার ফেলে, সরকার বসায়। কোনো দেশের

গত ১৫ আগস্ট লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী এদের ঠিক নামই দিয়েছেন- 'দিমাগি নকশাল'।

'নকশাল' কোনো দল বা নির্দিষ্ট সংগঠন নয়। এটা একটা মানসিকতা, এটা একটা ধবংসাত্মক প্রবৃত্তি। এই ধরনের ঘৃণ্য

মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি কোনো বাম, অতিবাম বা মাওবাদী দলের সদস্য হতেও পারেন, নাও হতে পারেন। এরা ভারতকে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি।

সরকার আন্তর্জাতিক গুপ্ত প্রশাসনের নীতি মানতে অস্বীকৃত হলে বিভিন্ন এজেন্সি ও ঢালাও অর্থের প্রয়োগে সেই দেশে কালার রেভোলিউশন, সামরিক অভ্যুত্থান, জেহাদি অভ্যুত্থান এই আন্তর্জাতিক প্রভুদের কাছে জলভাতা বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ লুণ্ঠ, আকাশ, সমুদ্র ও মহাসমুদ্রের দখলদারিতে কোনো সরকার বাধা সৃষ্টি করলে, সেই সরকারকে সরিয়ে পছন্দের তাঁবেদার সরকার বসিয়ে লুণ্ঠতন্ত্র বজায় রাখাটা এইসব এজেন্সির কাজ। যেখানে আমেরিকা-স্থিত গ্লোবাল ডিপস্টেটের স্বার্থ নেই, সেখানে 'গণতন্ত্র'-এর নামে তারা রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়। ভারতের ক্ষেত্রেও চলছে তাদের একই ছক। ২০১৪-র পর থেকে ভারতের উন্নয়নের রেখচিত্র যখন ক্রমশ উর্ধ্বগামী হয়ে চলেছে, তখন হঠাৎ করে দেশের আনাচেকানাচে 'গণতান্ত্রিক অধিকার', 'পরিবেশ', 'ধর্ম', 'কৃষক', 'জাতিগত সংরক্ষণ', 'সংখ্যালঘু'-র নামে আগুন জ্বলছে রবা এগুলো কি এমনি এমনি হয়? হয় না। কারণ 'No donations comes free' বিদেশ থেকে আসা প্রতিটি ডলারের গায়ে শর্ত লেখা থাকে। সেই শর্ত হলো ভারতের উত্থানের গতিকে থামিয়ে দাও। কর্পোরেট দুনিয়ার প্রভুদের করায়ত্ত অধিকাংশ মিডিয়া হাউজ। তাদের কাছে News is also a business। বিচারবিভাগ ও আমলাতন্ত্রের একাংশ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, মিডিয়া হাউজ, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার,

চলচ্চিত্র পরিচালক, তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহল, মানবাধিকার কর্মী- সবাই বিদেশি প্রভুদের কেনা গোলাম হয়ে যায়। প্রস্তাবিত এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল এই গোলামির শিকল ভাঙবে। বৈদেশিক অনুদানের প্রতিটি পয়সার হিসাব চাইবে। কোথা থেকে অর্থ এল, কার পকেটে গেল, কোন আন্দোলনে খরচ হলো- সব এবার কেন্দ্রীয় সরকারের নজরদারির আওতায় থাকবে।

চোখের সামনে রয়েছে বাংলাদেশের উদাহরণ। শ্রীলঙ্কা, নেপালেও একই স্ক্রিপ্ট; প্রথমে ছাত্র, তারপর মব (উন্মত্ত জনতা), তারপর সরকার ফেলে তাঁবেদার সরকার বসানোর চেষ্টা। আপাতত ব্যর্থ হলেও একই স্ক্রিপ্ট এখন ভারতের জন্য লেখা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক এজেন্সিগুলির মদতে স্ক্রিপ্ট লেখকরা ভাবছেন যে, ভারতের ২২ কোটির একটি অংশকে মজহবের নামে উসকে দিয়ে দিল্লির বৃকে ৫-১০ লাখ লোক নামিয়ে দিলেই খেলা শেষ। উদ্দেশ্য একটাই- 'রেজিম চেঞ্জ'। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারকে ফেলে দিয়ে ভারতের ৮ শতাংশ গোথের ইঞ্জিনে ব্রেক কষা।

'দিমাগি নকশাল': এরা হলো সুট-বুট পরা দেশদ্রোহী। জঙ্গলের মাওয়িস্ট সন্ত্রাসবাদীদের শেষ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন পূর্বতন কোনো সরকার ভারতের বিস্তীর্ণ প্রান্ত থেকে জঙ্গুলে মাওবাদীদের সম্পূর্ণ উৎখাত করতে পারেনি। অক্ষত থেকে গিয়েছে 'রেড করিডোর'। গত ৩১ মার্চের মধ্যে লাল সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে সফল হয়েছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। ভারতের অরণ্যঞ্চল থেকে উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়েছে সশস্ত্র মাওবাদীদের। কিন্তু আসল শত্রু এখন জঙ্গলে নেই। তারা এখন এসি ঘরে বসে। গত ১৫ আগস্ট লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী এদের ঠিক নামই দিয়েছেন- 'দিমাগি নকশাল'। 'নকশাল' কোনো দল বা নির্দিষ্ট সংগঠন নয়। এটা একটা মানসিকতা, এটা একটা ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি। এই ধরনের ঘৃণ্য

মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি কোনো বাম, অতিবাম বা মাওবাদী দলের সদস্য হতেও পারেন, নাও হতে পারেন। এরা ভারতকে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি। এরা থাকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে, কোর্টে, ব্যুরোক্রেসিতে, নিউজরুমে, বলিউডে। বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত 'বুদ্ধ ইন এ ট্রাফিক জ্যাম' সিনেমায় এদেরই গল্প প্রদর্শিত হয়েছিল।

এরা হলো গিরগিটির মতো। বিভিন্ন রং, পরিচয় বদল করে প্রতিমুহূর্তে আবির্ভূত হয়। কখনো এরা নয়াদিল্লিতে সিএ-র বিরোধিতার নামে শাহিন বাগ বসায়। কখনো খালিস্তানিদের হাত ধরে 'কৃষক আন্দোলন' করে, যেখানে প্রকাশ্যে সমর্থন জানায় কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। পঞ্জাব-হরিয়ানার কয়েকজন ধনী কৃষককে সামনে রেখে সারা দেশের কৃষকদের ভবিষ্যৎ বন্ধক রেখে পার্লামেন্টে পাশ হওয়া কৃষি বিলকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিঁড়ে ফেলে দেয়া। কখনো ওয়াকফ (সংশোধনী) আইনের বিরোধিতার নামে, কখনো অন্য কোনো ইস্যুতে এরা নৈরাজ্য তৈরি করে। এদের পেট থেকেই বের হয় 'টুকরে-টুকরে গ্যাং', যাদের মুখে মুখে ফেরে স্লোগান- 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে ইনশাআল্লাহ', 'হিন্দুয়ৌ কী কবর খোদেঙ্গে হিন্দুয়ৌ কী ধরতি পর'।

তথাকথিত সংখ্যালঘু অধুষিত চিকেন নেককে ঘিরে ফেলে ভারত থেকে পশ্চিমবঙ্গ-সহ গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার ফতোয়া দেয় এদের নেতা উমর খালিদ, শার্জিল ইমাম। এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল পাশ হওয়া আটকাতে নয়াদিল্লির আবির্ভূত হয় লালরঙা আরশোলা, যাদের একমাত্র লক্ষ্য চতুর্দিকে চরম অরাজকতা সৃষ্টি। আমেরিকার বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার দাবিদার, আম আদমি পার্টির পূর্বতন নেতা, একদা সামাজিক মাধ্যমে 'AAPtimist' পরিচয়ে খ্যাত অভিজিৎ দিপকে হলো এই আরশোলাদের নেতা। তাদের আন্দোলনে যোগ দিয়ে যোগেন্দ্র যাদবের মতো

আন্দোলনজীবীরা মন্তব্য করে যে, এবার সরকার থেকে নয়, 'রাস্তা' থেকেই পরিচালিত হবে দেশা সংসদ নয়, এবারক থেকে আইন তৈরি ও খারিজ করবে রাজপথের আন্দোলন। এহেন চরম অগণতান্ত্রিক শক্তি আবার তাদের আন্দোলনে সমবেত কঠোর ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করে, বাবাসাহেব ড. বি.আর. আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে তারা মাল্যদান করে। এসবের মাধ্যমে তাদের সব ভণ্ডামি ধরা পড়ে।

উন্নয়ন আটকাও মিশন- নিকোবর থেকে ব্যাঙ্গালোর: এদের সবচেয়ে বড়ো টার্গেট হলো ভারতের উন্নয়ন। কারণ উন্নয়ন হলেই বিনিয়োগ আসবে, চাকরি হবে, ভারত শক্তিশালী হবে। আর সেটা হতে দেওয়া যাবে না।

দেখা যাক নিকোবরের দিকে। ভারত সরকার ৭৫ হাজার কোটি টাকা খরচ করে নিকোবরে গভীর সমুদ্র বন্দর, সামরিক নৌ-ঘাঁটি, প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন প্রকল্প ও আধুনিক পর্যটন হাব বানাতে চাইছে। এটা শুধু সমুদ্র বন্দর নয়, এটা চীনের 'স্ট্রিং অফ পার্লস'-এর বিরুদ্ধে ভারতের জবাব, মালাক্কা প্রণালীর মুখে ভারতের নজরদারি। পরিবেশের সব ছাড়পত্র পাওয়ার পরেও কারা এর বিরোধিতা করছে? বাম আর কংগ্রেস কেন? কারণ চীনের স্বার্থে আঘাত লাগবে, তাই বিদেশি টাকায় পরিবেশের দোহাই দিয়ে এই প্রকল্পকে আটকানোর চক্রান্ত চলছে। এই প্রকল্প বন্ধ করার লক্ষ্যে শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের করেছে স্বার্থান্বেষী মহলা। তাদের পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে পরিবেশ ধ্বংসের অজুহাত। কতটা মরিয়া ভাবুন দেশের আদালতে না পেরে লন্ডন ভিত্তিক NGO SURVIVAL INTERNATIONAL এর হাত ধরে রাষ্ট্রসংঘের দ্বারস্থ। ফল অশুভ। ২৫ শে আগস্ট CRED নামে UN এর জাতি গত বৈষম্য কমিটির উদ্বেদ ৩০০ জন শম্পেন উপজাতির জন্য, তারা বিজয়োল্লাসে প্রচার করছে "রাষ্ট্রসংঘ নিকোবর বন্ধ করতে

বলেছে ভারত সরকার মানতে বাধ্য” ও “UN প্রমাণ করলো নিকোবর প্রকল্প অবৈধ” এ দুটোই সর্বৈব মিথ্যা। বিদেশ মন্ত্রক “রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও Highly malicious reference, যা প্রত্যাখ্যানযোগ্য” আখ্যা দিয়ে ২৭শে আগস্ট প্রত্যাখ্যান করে, নিকোবর প্রজেক্ট পুরোদমে চলছে।

১২ ডিসেম্বর, ২০২০-র ঘটনা। তাইওয়ানের কোম্পানি 'উইফ্টন' হলো আই ফোন নির্মাতা সংস্থা 'অ্যাপল'-এর কন্ট্রাস্ট ম্যানুফ্যাকচারার। ব্যাঙ্গালোরের কাছে নরসাপুরায়, উইফ্টন-এর ১০,৫০০ কর্মীর কারখানা। চীন থেকে অ্যাপলের বিনিয়োগ সবে তখন ভারতে এসেছে। কর্মচারীদের বেতন দিতে ৪ দিন দেরি হওয়াতেই বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন পুরো কারখানা ভেঙে দিল। কয়েকশো কোটি টাকা মূল্যের আই ফোন, মোবাইল ফোন তৈরির যন্ত্রপাতি তারা গুঁড়িয়ে দিল। উদ্দেশ্য কী? শ্রমিক স্বার্থরক্ষা? না। উদ্দেশ্য হলো বিশ্বকে বার্তা দেওয়া যে 'ভারতে বিনিয়োগ করলে ভাঙচুর হবে'। যাতে অ্যাপল আবার চীনের কাছেই হাত জোড় করো ভারত থেকে বিনিয়োগ তুলে নিয়ে চীনে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এই ঘটনায় মূল চক্রী ধরা পড়ে। সে ছিল এক এসএফআই ছাত্রনেতা, নাম তার- শ্রীকান্ত। চীনা প্রভুদের স্বার্থরক্ষায় ভারতের বামপন্থীরা কতখানি নিবেদিতপ্রাণ-ব্যাঙ্গালোরের ঘটনাটি হলো তারই প্রমাণ।

আর এটাই হলো নতুন অর্থনৈতিক জেহাদ। দেশের নানা প্রান্তে সরাসরি সশস্ত্র আক্রমণ নয়, দেশের উন্নয়নকেই গলা টিপে মেরে দেওয়া যার বহু উদাহরণ আছে।

চার্চ, মসজিদ আর আইএসআই-এর টাকার খেলা: জনজাতি বা পরিবেশের নামে আন্দোলন হলেই দেখতে হবে এক পেছনে কারা সক্রিয় রয়েছে। ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাবে কোনো চার্চ জড়িত। আবার সেই আন্দোলনের ফান্ডিং আসছে জর্জ সোরোস-এর কাছ থেকে। গ্লোবাল ডিপস্টেটের অংশ ইভাঞ্জেলিকাল শক্তির দ্বারা পরিচালিত চার্চ, পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত

মসজিদগুলো কোনো প্রার্থনার জায়গা নয়, এগুলি রাজনীতির অফিস। ইসলামি বিশ্বের পেট্রো ডলার ও হালাল অর্থনীতি থেকে সংগৃহীত অর্থ নানান মাধ্যমে ভারতে পাঠিয়ে থাকে পাক সামরিক সংস্থা আইএসআই, জেহাদি নেতা জাকির নায়েকের সংস্থা। সেই টাকায় ভারত জুড়ে চলে ওয়াকফ-মাফিয়াদের রাজত্ব, লাভ জেহাদ, ল্যান্ড জেহাদ, মাদ্রাসা নেটওয়ার্ক, ডেমেগ্রাফিক চেঞ্জ, রাজনৈতিক নেতা, গুরুত্বপূর্ণ আমলা, সামরিক অফিসারদের হানি ট্র্যাপিং, গোরুপাচার, মাদক পাচার, জাল নোট পাচার, আগ্নেয়াস্ত্রের কারবার ও ইসলামি সন্ত্রাসবাদ। বিদেশি ইভাঞ্জেলিকাল মিশনারিদের টাকা ভারতে ঢুকে বিভিন্ন চার্চের দ্বারা ধর্মান্তরণের মাধ্যমে ভারতের ঐক্য ও সংহতির বিরুদ্ধে বিষ ছড়ায়। পরিণামে মধ্য ভারতে সৃষ্টি হয় মাওবাদ, উত্তর-পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়ে বিচ্ছিন্নতাবাদ। এমতাবস্থায় দেশের ডিজিটাল বর্ডার গার্ডিং, ফাইন্যান্সিয়াল বর্ডার গার্ডিং যেকোনো সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব। তাই সেই লক্ষ্যে সময়োপযোগী আইন প্রণয়ন আজ সময়ের দাবি।

এবার আপোশ নয়, দরকার প্রতিরোধ, পাল্টা আঘাত: বিশ্বের যারা নিজেদের 'নিয়ন্তা' ভাবে, তারা কখনোই চাইবে না ভারত মাথা তুলে দাঁড়াক। আপাতত তারা ভারতের সামনে বন্ধুর মুখোশ পরে আছে। কিন্তু ভেতরে তারা চায় ভারত আবার সেই ১৯৯১-এর ভিখারি ভারত হয়ে যাক। তাই তারা সরাসরি যুদ্ধ করবে না। প্রথাগত যুদ্ধ এড়িয়ে তারা ভারতের ঘরের লোকদের দিয়েই ভারতীয়দের মারবে। সমাজসেবার অন্তরালে এনজিও-র নামে, সিভিল সোসাইটি-র নামে, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার নামে তারা আন্দোলন গড়ে তুলবে। এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল পাশ হলে তাদের এই খেলা অনেকটাই বন্ধ হবে। নির্দিষ্ট কোনো এনজিও-র বিরুদ্ধে নয় এই আইন নয়। এটা ভারতের ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে একটি আইন। যারা সত্যিকারের সমাজসেবামূলক কাজ করেন, তাদের এই আইনে কোনো ভয় নেই। ভয়

তাদের যারা বিদেশি ডলারে দেশ বিক্রি করে। আজ ভারতের সামনে দুটো রাস্তা। একটা হলো বাংলাদেশের রাস্তা- জেহাদি মবোক্রেসি, ধ্বংস, নিকষ কালো অন্ধকার। আরেকটা হলো বিকশিত ভারতের রাস্তা- শৃঙ্খলা, উন্নয়ন, আত্মসম্মান।

কলকাতায় হাঁসফাঁস অবস্থায় জিহাদি নেটওয়ার্ক তৃণমূল সরকারের পতনে ও বিজেপি সরকারের দ্রুত অ্যাকশনে পশ্চিমবঙ্গে যে দম ফেলার জায়গা বা সেফ হেভেন ছিল সেটাও নেই। BSF কে দ্রুত জমি দিয়ে জিহাদী শক্তির অবাধ যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ হবার পথে।

প্রধানমন্ত্রী যে 'দিমাগি নকশাল'-দের চিহ্নিত করেছেন, প্রস্তাবিত এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল, ২০২৬ হলো তাদের বিরুদ্ধে প্রথম সার্জিকাল স্ট্রাইক। এবার আর পেছনে ফেরার জায়গা নেই। দেশের স্বার্থে, আগামী প্রজন্মের সার্বিক সুরক্ষার লক্ষ্যে এই যুদ্ধ ভারতীয়দের জিততেই হবে। আর নৈরাশ্যবাদীদের মুখে ছাই দিয়ে ভারতের নতুন রেকর্ড, ২০২৪-এ \$৭০৪ বিলিয়ন ছিল স্বপ্ন, আজ \$৭২৯.৩৩ বিলিয়ন - ভারতের রিজার্ভ অল-টাইম হাই। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম ট্রৈমাসিক (Q1 FY27)-এ ৭.৮% গ্রোথ, ম্যানুফ্যাকচারিং ৯.২%, সার্ভিস ১২.১%, বিনিয়োগ ১১.৯% - যখন বিশ্ব যুদ্ধ, তেল \$৮৫ আর গ্যাস সংকটে কাঁপছে। এটাই মোদী সরকারের স্টেটসম্যানশিপ। FCNR স্কিমে \$৬৫ বিলিয়ন টেনে রূপিকে ৯৫.৩৮-এ বাঁধা, সার্ভিস রপ্তানিতে ডাবল ডিজিট গ্রোথ - ডিজিটাল ইন্ডিয়া, মেক ইন ইন্ডিয়ার ফসলা। তাই দেশবিরোধী ইকোসিস্টেমের ঘুম উড়ে গেছে, ভালো খবর এলেই এরা বেশি উত্তেজিত। রিজার্ভ বাড়লে বলে "টেকসই নয়", গ্রোথ বাড়লে বলে "ডাটা ভুল"। মোদীকে আক্রমণ করতে গিয়ে দেশকেই আক্রমণ করে বসে। বিশ্ব ভারতকে fastest growing economy বলে স্যাঁলুট দিচ্ছে, ১৪০ কোটি মানুষ পরিশ্রম করছে, আর এরা বিলাপ করছে, যত জ্বলবে এরা, ভারত তত জ্বলজ্বল করবে, উজ্জ্বল হবে- এটাই আজকের সত্য।

পশ্চিমবঙ্গের

যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন দিগন্ত



১,০৪২.৬২ কোটি টাকা অনুমোদন:

সেন্ট্রাল রোড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড (CRIF)
প্রকল্পের আওতায় এই অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

১৯৪.১০ কিলোমিটার সড়কের উন্নয়ন:

ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সম্প্রসারণ ও
শক্তিশালীকরণের কাজ হবে।

নিরাপদ ও দ্রুত যাতায়াত:

যাতায়াতের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে এবং
সামগ্রিক সড়ক সুরক্ষা আরও সুদৃঢ় হবে।

জনজীবনে আরও সহজ যোগাযোগ:

বিভিন্ন এলাকার মানুষ সরাসরি বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও
স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে আরও সহজে যুক্ত হতে পারবেন।

আরও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, আরও মসৃণ যাতায়াত-উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলুক পশ্চিমবঙ্গ!

[f](#) [x](#) [v](#) [@](#) /BJP4Bengal [bjpgbengal.org](#)



ব্রিকস সম্মেলন ও মোদীর নেতৃত্বে ভারত

বিনয়ভূষণ দাশ

ব্রিকস সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে 'নয়াদিল্লি ঘোষণা ২০২৬' ভারতের একটি অন্যতম বড় কূটনৈতিক জয়। ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো দেশগুলির মধ্যে আঞ্চলিক মতভেদ ও ভূ-রাজনৈতিক টানাপোড়েন সত্ত্বেও ভারত সব সদস্য দেশকে এক মঞ্চে এনে শূন্য বিরোধিতায় এই যৌথ ঘোষণা পাস করাতে সক্ষম হয়। ঘোষণায় পাহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানানো হয় এবং আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করা হয়, যা আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের বড় সাফল্য।

গত ১২-১৩ সেপ্টেম্বর নতুন দিল্লির প্রগতি ময়দানে অবস্থিত ভারত মন্ডপমে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হল অষ্টাদশ ব্রিকস সম্মেলন। এই সম্মেলনে সমবেত হন সদস্য দেশগুলির প্রতিনিধিগণ, বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্ণধারগণ, বিভিন্ন স্টার্টআপ সংস্থা, ব্রিকস বিজনেস কাউন্সিল এবং উইমেন্স বিজনেস অ্যালায়েন্স ইত্যাদি সংস্থা।

এই সম্মেলনের মূল থিম ছিল, প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠার সক্ষমতা নির্মাণ, উদ্ভাবন, সহযোগিতা এবং স্থায়িত্ব নির্মাণ। ১২ সেপ্টেম্বর এই সম্মেলনে ব্রিকসের অন্তর্ভুক্ত ১১টি দেশ সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। সাম্প্রতিক মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কাঁটা সরিয়ে এই সম্মেলনে শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত

কূটনৈতিক জয় পেয়েছে। সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে 'BRICS Joint Declaration 2026' বা 'নয়াদিল্লি ঘোষণা ২০২৬' গৃহীত হয়েছে। দিল্লি ঘোষণা হল একটি সর্বসম্মত ঘোষণাপত্র যেখানে বলা হয়েছে, বিশ্বব্যাপী শাসন সংস্কার, আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ, বাণিজ্য ও অর্থ, শক্তি ও জলবায়ু নীতি, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, কৃষি এবং মানুষে মানুষে সহায়তা করার আহ্বান। যদিও ইরান যুদ্ধ এবং ট্রাম্পের শুষ্ক নীতির সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি, তা সত্ত্বেও এই প্রস্তাবে বা ঘোষণাপত্রে একতরফাভাবে শুষ্ক চাপানোর নিন্দা করা হয়েছে। ব্রিকস বাণিজ্য ফোরামে প্রধানমন্ত্রী মোদী ঘোষণা করেছেন, দেশগুলির মধ্যে বিনিয়োগ বাড়ানো, অর্থনৈতিক সংযোগ শক্তিশালী করা এবং বিশ্ব দক্ষিণের দেশগুলির জন্য নতুন সুযোগ তৈরির আহ্বান করেছেন।

তিনি এই ঘোষণাপত্রে সহমত প্রকাশ করেছে পারস্পর যুযুধান দুই শত্রু দেশ ইরান ও সংযুক্ত আমিরশাহি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের পরিবর্তে হার্ড কারেন্সি বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা হিসেবে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির মুদ্রাকে নিজেদের দেশগুলির মধ্যে লেনদেনের মুদ্রা হিসেবে ব্যবহারের কোন কথা বলা হয়নি এই ঘোষণায়, কিন্তু আন্তর্জাতিক মুদ্রা হিসেবে ডলারের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা। নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে নিজেদের দেশের মুদ্রাকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই সম্মেলনে গুরুত্ব পেয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য। তিনি বার্তা দিয়েছেন, বিশ্বব্যাপী নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আরও বেশী করে এগিয়ে আসতে হবে দক্ষিণ গোলাধারের দেশগুলিকে। এই সঙ্গে তাঁর বক্তব্য, এই জোটের এগারোটি দেশ কারও বিরুদ্ধে নয়, দেশগুলি পারস্পরিক সহযোগিতায় আস্থাবান। এই ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি আগামী দিনে একে অন্যের পাশে থাকবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, দিল্লি ঘোষণাপত্র সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে; কোনও দেশই এই ঘোষণাপত্রের কোন বিষয় নিয়ে আপত্তি জানায়নি। এই সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়েছে, রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার জরুরী, এই সংস্কারে আর বিলম্ব হওয়া উচিত নয়। স্মার্তব্য যে, দীর্ঘদিন হয়ে গেলেও নিরাপত্তা পরিষদের কোন সংস্কার করা হয়নি। এছাড়া এই ঘোষণায় পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটে দুশ্চিন্তা ব্যক্ত করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বে যে জ্বালানি তেলের সঙ্কট তৈরি হয়েছে সেকথাও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রস্তাবের প্রধানমন্ত্রী মোদী এই সম্মেলনে পিছিয়ে পড়া দেশগুলির পক্ষে সোচ্চার হয়েছেন। তিনি আবেদন জানিয়েছেন, 'গ্লোবাল সাউথ' যেন শুধু আন্তর্জাতিক বিধিবদ্ধতার গ্রহীতা হয়ে না থাকে, যেন নীতি নির্ধারণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে 'জিরো টলারেন্স' নীতি অবলম্বনের আহ্বান জানানো হয়েছে। এই সম্মেলনে এছাড়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র



খালেদ বিন মহাম্মদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক এই বৈঠকগুলি যথেষ্ট ইতিবাচক হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। পহেলগাঁও হামলার নিন্দা করা হয়েছে পাকিস্তানের উল্লেখ না করে। আর চিনকে সামনে বসিয়েই এই নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। এই সংক্রান্ত বিবৃতিতে চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও অন্যান্যদের

প্রধানমন্ত্রী মোদী এই সম্মেলনে পিছিয়ে পড়া দেশগুলির পক্ষে সোচ্চার হয়েছেন। তিনি আবেদন জানিয়েছেন, 'গ্লোবাল সাউথ' যেন শুধু আন্তর্জাতিক বিধিবদ্ধতার গ্রহীতা হয়ে না থাকে, যেন নীতি নির্ধারণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে 'জিরো টলারেন্স' নীতি অবলম্বনের আহ্বান জানানো হয়েছে। এই সম্মেলনে এছাড়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান এবং সৌদি আরবের প্রতিনিধি খালেদ বিন মহাম্মদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে।

সঙ্গে স্বাক্ষর করেছেন। এটা অবশ্যই ভারতের একটা বড় কূটনৈতিক জয়। মোদী-শি বৈঠকে দুই দেশের সীমান্ত ও দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। অন্যদিকে ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের সঙ্ঘাতের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ভারত পুতিনকে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তির আবেদন জানিয়েছে। অবশ্যই ব্রিকসের মূল সম্মেলনের বাইরে মূল আকর্ষণ ছিল মোদী-পুতিন দ্বিপাক্ষিক বৈঠক। মাত্র দুই সপ্তাহের ব্যবধানে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তাঁরা বৈঠকে মিলিত হন। ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে বিশেষ ও সুবিধাপ্রাপ্ত কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী করার বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

মোদী বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান এবং সৌদি আরবের প্রতিনিধি

তেল, প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, পরমাণু শক্তি, মহাকাশ ও প্রযুক্তি সহযোগিতা ছিল আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পশ্চিম এশিয়ার সংঘর্ষ নিয়েও তাঁরা মত বিনিময় করেন। অবশ্যই দুই দেশের মধ্যে



সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে জালালি রাশিয়া ভারতের অন্যতম প্রধান অপরিশোধিত তেল সরবরাহকারী দেশ। এই সঙ্গে ২০৩০ সালের মধ্যে এই দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ১০০ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রয়েছে উভয় দেশের। শুধুমাত্র অস্ত্র কেনাবেচার সম্পর্ক ছাপিয়ে দেশ দুটি এখন যৌথ উৎপাদন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং গবেষণার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে এই দুই দেশ।

এই সম্পর্কে বিস্তারিত বিষয়ে যাওয়ার আগে আমরা সংক্ষেপে জেনে নি' ব্রিকস সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বে কয়েকটি উদীয়মান অর্থনীতির দেশের সমন্বয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন ব্রিকস। এই সংগঠনটি স্থাপিত হয়েছিল ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে। ব্রিকস এর মূল ভাবনাটির কারিগর আমেরিকান ব্যাঙ্ক গোল্ডম্যান সাক্সের অর্থনীতিবিদ জিম ও' নীলা তিনি ব্রিক এর ধারণাটি প্রথম ২০০১ খ্রিস্টাব্দে চয়ন করেন দ্রুত উন্নয়নশীল দেশগুলিকে চিহ্নিত করে নিচে ব্রিকসের মূল উদ্দেশ্যগুলি লিপিবদ্ধ করছি।

- ১। সংশ্লিষ্ট দেশগুলির অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং উন্নয়ন,
- ২। বিশ্বের শাসনবিধির সংস্কার,
- ৩। একটি বহুমুখী বিশ্বের জন্য কাজ করা,
- ৪। আর্থিক স্বাভাবিকতা,
- ৫। নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক সহযোগিতা,
- ৬। স্থায়ী বাটেকসই উন্নয়ন এবং প্রযুক্তি।

ব্রিকস সংগঠনটি অর্থনৈতিক সহযোগিতা, ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি, 'বৈশ্বিক দক্ষিণ' বা 'গ্লোবাল সাউথ' দেশগুলির স্বরকে শক্তিশালী করা, এবং পশ্চিমী বিশ্বের সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে ভারসাম্য রক্ষাকারী সংগঠন কাজ করে। ২০২৪-২৫ সালে এটি সম্প্রসারিত হয়েছে এবং এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মিশর, ইথিওপিয়া, ইরান, সৌদি

আরব, ইন্দোনেশিয়া এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি সম্প্রসারণের পরে ব্রিকসের অন্তর্ভুক্ত মোট দেশের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে এগারোতে। ১লা জানুয়ারি ২০২৬ থেকে এই গোষ্ঠীর সভাপতি হিসেবে ব্রাজিলের হাত থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। ব্রিকসের ১৭তম সম্মেলন ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনেইরোতে ২০২৫ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ব্রিকসের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মোট জনসংখ্যা পৃথিবীর জনসংখ্যার ৪০% এবং বৈশ্বিক জিডিপি-র ৩৭ শতাংশ। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ব্রিকস-ভুক্ত দেশগুলির ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রিকসের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৬ জুন ২০০৯ এ রাশিয়ার ইয়েকাতেরিনবারগো। এই সম্মেলনে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। এই সংস্থা নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক নামে একটি ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করে। এটির কেন্দ্রীয় দফতর রাশিয়াতে। ব্যাঙ্কটি আইএমএফের বিকল্প আর্থিক সংস্থা হিসেবে গণ্য হয়।

ব্রিকসে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বেশ কয়েকটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতির দেশ, যেমন ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। এই সংস্থা অর্থনৈতিক সহযোগিতা, বৈশ্বিক শাসন ব্যবস্থা,



আর্থিক স্বাভাবিকতা এবং রাজনৈতিক সহযোগিতা এবং স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। সদস্য দেশগুলি ছাড়াও সহযোগী দেশসমূহ যেমন উজবেকিস্তান, উগান্ডা, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড এবং নাইজেরিয়া রয়েছে। এই সংস্থা ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে সম্প্রসারিত হয়েছে যার ফলে উদীয়মান অর্থনৈতিক দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার বাতাবরণ গড়ে তুলবে। আশা করা যায়, শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত আগামী দিনে ব্রিকস এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।



কিংবদন্তি শিল্পী ভারতরত্ন ড. ভূপেন হাজারিকার শততম
জন্মবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর শ্রদ্ধার্ঘ্য।



কিরগিজস্তানের বিশকেক-এ আয়োজিত ২৬তম 'সাংহাই সহযোগিতা
সংস্থা শীর্ষ সম্মেলন'-এর ফাঁকে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক
অর্পণ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শ্রদ্ধা নিবেদন।



দিল্লির শ্রী রাম কলেজ অফ কমার্স-এর শতবর্ষ উদযাপনে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ।



২০২৬ সালের শিক্ষক দিবস উপলক্ষে, ৭ লোক কল্যাণ মার্গে ৮২ জন 'জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার'
বিজয়ীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মতবিনিময়।

নতুন রেলপথ, নতুন গতি, নতুন সম্ভাবনা!



১০,৭৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে কেন্দ্রের অনুমোদিত ৩টি
গুরুত্বপূর্ণ মাল্টিট্র্যাকিং প্রকল্পে বাড়বে ৬৫৬ কিমি রেল
নেটওয়ার্কের সক্ষমতা।

অনুমোদিত প্রকল্পগুলি-

খড়গপুর - ঝাড়সুগুড়া (বাগদেহি) চতুর্থ লাইন
কার্জনী - পেন্দ্রা রোড চতুর্থ লাইন
বিলাসপুর (উসলাপুর) - পেন্দ্রা রোড তৃতীয় লাইন

পশ্চিমবঙ্গসহ ৫ রাজ্যের **৫৬ লক্ষ** মানুষ
পাবেন উন্নত রেল যোগাযোগের সুবিধা।
তৈরি হবে ২৭ MTPA অতিরিক্ত মালবাহী
পরিবহণের সক্ষমতা।



যোগাযোগের নতুন সেতুবনা খুলবে উন্নয়নের নতুন দুয়ার

[f](#) [X](#) [v](#) [i](#) /BJP4Bengal [globe](#) bjpbengal.org